বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

জিজ্ঞাসা

আধুনিক কালে আমরা নানা রকমের সংগীত উপভোগ করছি ; যেমন ধ্রুবপদ, খেয়াল, ঠুংরি, গজল, আধুনিক সংগীত, কীর্ত্তনগান ইত্যাদি। যাঁরা সংগীতের অনুশীলন করেন এবং যাঁরা শিল্পী—তাঁরা এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সংগীত-সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করে এগুলিকে মনের রাজ্যে সাজিয়ে রাখছেন, এদের আদর্শ চিন্তা করছেন, দোষগুণ বিচার করছেন। মাসিক পত্রিকা ও বিশেষ গ্রন্থ সকলের মধ্যে এই সকল অনুশীলনের সংবাদ আমরা পাই।

প্রাচীন কালে কিরূপ সংগীতছিল, এবং প্রাচীনেরা সংগীত সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করতেন—এরূপ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। এখন সংগীত যেরকম বহুরূপী হয়েছে, প্রাচীন কালেও কি সেইরূপ বহুরূপী ছিল ? আমরা সংগীত সম্বন্ধে ও সংগীতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখন যেরকম চিন্তা বা জল্পনা-কল্পনা করি—প্রাচীনেরাও কি সেই রকম চিন্তা করতেন ? প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে কি কোনও সনাতন যোগসূত্র আছে, না কালে কালে দেশে দেশে ভিন্নরূপ সংগীতের উদয় ও অস্ত হয়ে যাচ্ছে, যাদের মধ্যে সাধারণ বলতে কিছু চিন্তা হয় না ?

ইতিহাস থেকে প্রাচীন কালের সংবাদ আহরণ করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইতিহাস ত রাজ-রাজড়ার যুদ্ধ, দেশজয় ও বংশাবলী নিয়েই ব্যস্ত। এই সকল জয়-ঘণ্টার নিনাদের মধ্যে বীণা ও সেতারের আওয়াজকে পাওয়া যাবে না। বাদশাহ আলাউদ্দিন ও আকবরের সময়ে রচিত ইতিহাসের মধ্যে কিছু অংশ পাওয়া যায়—যা থেকে মনে করা যায় যে তাঁদের সময়ে গান-বাজনার সমধিক প্রচলন ছিল, এবং সংগীত সম্বন্ধে চিন্তা করবার একটি ব্যবহারিক ভূমিকাও গড়ে উঠে থাকবে। কিন্তু আলাউদ্দিন ও আকবরকে প্রাচীন কালের ব্যক্তি বলা যায় না, যেমন বুদ্ধদেব বা বিক্রমাদিত্যকে বলা যায়। যাই হোক্ খিলজি

বাদশাহের সময়ে সংগীত-চিন্তা বলতে তবুও একটা কিছু পাওয়া যায়। এর আগে ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাইনা ; যা পাই তা নিতান্ত সাধারণ কথা, অর্থাৎ গায়ক বাদক নর্তক তখন ছিল, এই মাত্র।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের চিন্তার ভাণ্ডার—পুরাণ, মহাকাব্য, কাব্য, উপনিষৎ ও দর্শন-শাস্ত্রাদির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এমন অনেক কথা, গল্প বা বর্ণনা পাওয়া যায়—যা থেকে আমরা প্রাচীন কালের সংগীত-চিন্তা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। সেগুলিতে অল্পসংখ্যক এমন কথাও পাওয়া যায় যার সম্বন্ধে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে লেখকের সময়ে সংগীতের সমধিক প্রচলন ত ছিলই, চিন্তার পারিপাট্যও সম্ভব হয়েছিল, এমন কি সংগীতের দিকে দার্শনিক দৃষ্টিপাতও করা হয়েছিল।

ব্যক্তিসাধারণের আনন্দ-উৎসবের কার্যে গীত বাদ্য নৃত্ত হ'ত এর ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। গোষ্ঠীতে (club) সংগীতচর্চা হ'ত, ব্যক্তির গৃহে গান-বাজনার আয়োজন থাকত এসকল কথা পাওয়া যায়। রাজা দুর্গে বাস করবেন, অতএব দুর্গের মধ্যে গায়ক বাদক ও নর্তকদেরও বন্দোবস্ত করতে হবে। সংগীতের চর্চা করে পাছে রাজকার্যে হানি হয়, এজন্য রাজার পক্ষে গীত বাদ্য নৃত্তকে ব্যসন মনে করে উপদেশও দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি সংহিতা-গ্রন্থের মধ্যে এমন কথা পাওয়া যায় যা থেকে মনে হয় যে সংগীতের সমাদর থাকলেও সংগীত-শিল্পীদের, বিশেষ করে নর্তকদের প্রতি একটু অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি করা হয়েছে, এগুলি মোটা কথা। সংগীতের সমাদর সব সময়েই আছে, সংগীত না হলে উৎসব পরিপূর্ণ হয় না, বিলাসী ব্যক্তির পক্ষে সংগীতও একটি বিলাস-সামগ্রী। যাঁদের উপর রাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করার ভার ন্যস্ত তাঁরা পাছে সংগীতামোদে মগ্ন হয়ে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন, তাই সাবধান করে দেওয়া উচিত, এ তো সঙ্গত কথা এবং আজও সত্য। শিল্পীরা দিনের বেলায় আহার-নিদ্রার কার্য সমাধা করে—রাত্রিকালে সংগীতের মধ্যে

স্বর্গের সন্ধান দেবেন, তাতে সামাজিক ব্যক্তির বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু শিল্পী সামাজিক জীবনযাত্রার নিয়মকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরূপ অবস্থায় অনিয়ম থেকে একটু উচ্ছৃঙ্খলতাও হয়ে থাকে সন্দেহ নেই। অতএব এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছিল।

উৎসব, বিলাস, ব্যসন বা স্বর্গসৃষ্টি—এ সকল কথা ভাবলেই মনে হয় যে, সমস্তগুলির মধ্যে নিশ্চয় একটা কিছু পদ্ধতি, নির্দিষ্ট চিন্তাধারা বা প্রয়োজনবোধ ছিল, নইলে—অকস্মাৎ প্রদর্শনীর রাত্রিতে, গোষ্ঠীতে বা বিলাসগৃহে গীত বাদ্য নৃত্ত সম্ভব হবে কি করে? এই চিন্তাধারা, পদ্ধতি, প্রয়োজনবোধ কিরূপ সাহিত্যে পাওয়া যেতে পারে?

খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব থেকেই যে সংগীত সম্বন্ধে চিন্তা ও প্রয়োগ-পদ্ধতি ছিল তার একটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতি বিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং চ গচ্ছতি॥

অর্থাৎ:—যিনি বীণাবাদনের তত্ত্ব অবগত আছেন, শ্রুতি ও জাতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন এবং তাল বিষয়েও জ্ঞাত আছেন তিনি অল্পায়াসেই মোক্ষ অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী হন।

তাৎপর্য এই যে, নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী হওয়া বড় শক্ত কথা, অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়, পরিমার্জনা করতে হয়, অভ্যাস করতে হয়। সেইরূপ বীণাবাদনের তত্ত্ব শ্রুতি জাতি প্রভৃতি মূল ব্যাপারগুলির আলোচনা ও শ্রেণী-বিভাগ করণ এবং তালসকলকে অবগত হওয়া অনেক জ্ঞান, অনুশীলন ও অভ্যাস-সাপেক্ষ।

যাজ্ঞবল্ক্যের সময় বীণাবাদনের তত্ত্ব ছিল, শ্রুতি-জাতির চিন্তাসজ্জা ছিল এবং তাল বিষয়েও অনুশীলন হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, এই তিনটি ব্যাপারই বিশিষ্টরূপ চিন্তা ও প্রয়োগ-পদ্ধতির সূচনা করে এবং পরিভাষার অপেক্ষা করে।

উপরন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রায় যিনি ঐ সকল সাংগীতিক তত্ত্বকে আহরণ করেন তাঁকে প্রসঙ্গত এমন অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হয়, যাকে দার্শনিক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সংগীতের তত্ত্বের সঙ্গে কোনও না কোনও দার্শনিক তত্ত্বের যোগসাধন করা হয়ে থাকবে।

এ বিষয় ধারাবাহিক ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায় কয়েকটি সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে। এই গ্রন্থগুলি সমস্তই সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত।

সম্ভবত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে এই সংগীত-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়; অধিকাংশই পাণ্ডুলিপির আকারে ভারতের নানাস্থানে গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। কিছু কিছু মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশী, নারদ প্রণীত সংগীতমকরন্দ, শার্ঙ্গদেব প্রণীত সংগীত-রত্নাকর, সোমনাথকৃত রাগবিবোধ, দামোদর প্রণীত সংগীতদর্পণ, লোচনপণ্ডিত প্রণীত রাগতরঙ্গিণী এবং অহোবল প্রণীত সংগীত-পারিজাত—এইগুলি প্রসিদ্ধ ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক সমাদৃত। এদের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন ভরত-নাট্যশাস্ত্র। এর প্রণয়নকাল নির্দিষ্টরূপে জানা না গেলেও, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই মনে করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলি ক্রমশ উত্তরকালে রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে সংগীতরত্নাকর গ্রন্থ ১২১০—১২৪৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রণীত হয়েছিল বলে ডাঃ ভাণ্ডারকর অনুমান করেন। অন্যগুলির রচনা-কাল সম্বন্ধে কিছু না কিছু মতভেদ আছেই। এ সকল মতভেদের আলোচনা এখানে প্রয়োজন হবে না।

আমাদের যা প্রশ্ন—অর্থাৎ প্রাচীনকালের সংগীতচিন্তা কিরূপ ছিল—সেই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে, সংগীতরত্নাকর গ্রন্থেই এ বিষয়ে চরম আলোচনা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, প্রাচীন চিন্তাধারার শেষ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হল রত্নাকর। এর পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলিতে প্রধানত

আধুনিক ও অভিনব চিন্তাসমূহকে পাওয়া যায়। গৌণভাবে কিছু প্রাচীন চিন্তাকে অভিনব পরিভাষায় নূতন বেশে সজ্জিত হতে দেখা যায়।

অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে, সংগীতের ব্যাপারে অনেক কিছুই আছে যা চিরন্তন, এবং যাকে কিছুতেই প্রাচীন বা আধুনিক নাম দিয়ে শ্রেণীকরণ করা যেতে পারে না। যেমন—স্বরগুলির মধ্যে কয়েকটি শ্রুতিসুখকর সম্বন্ধ যা স্বাভাবিক নিয়মের অপেক্ষা করে। ষড়জ নামে যে স্বর এবং মধ্যম নামে যে স্বর, এদের সম্পর্ক আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখকর, সেরূপ ষড়জ ও পঞ্চম স্বরের সম্বন্ধ, ঋষভ ও ধৈবত স্বরের সম্বন্ধ, ঋষভ ও পঞ্চম স্বরের সম্বন্ধ, ইত্যাদি। এই রকমে বাদ্যগত ব্যাপার, এমন কি নৃত্তগত ব্যাপারের মধ্যেও স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে। এ সকল ব্যাপার চিরকালের জন্য সত্য ; এদের মধ্যে প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব নেই।

প্রাচীনত্ব বলতে তা হলে আমরা বাস্তবিক কি বুঝব ? এইটেই বুঝব যে, সংগীতের যা কিছু আয়োজন, নিশ্চয় তা কোনও উদ্দেশ্যমূলক। প্রাচীনগণ কি উদ্দেশ্যে সংগীতের আয়োজন করতেন ? সংগীতের আয়োজন করে প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষার ক্রম ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হয়। প্রাচীনগণ কিরূপ শিক্ষা ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করতেন ? সেগুলি কি আধুনিক কালের শিক্ষা ও পদ্ধতির মত, না অন্যরূপ ?

এ সকল বিষয়ে আমাদের কৌতূহল সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করতে পারে একমাত্র সংগীতরত্নাকর গ্রন্থ। এর মধ্যে আমরা সংগীতের সনাতন ধর্মগুলিকেও যেমন পাই, আবার প্রাচীনগণ সংগীত বলতে কি বুঝতেন, তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বলতে কি মনে করতেন, এবং উৎকর্ষসংগীতকে প্রয়োগ করতে হলে কি কি বিষয় ও কিরূপ সমাবেশ চিন্তা করতে হয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে।

যদিও নাট্যশাস্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে স্বীকৃত হয়েছে তবুও এই গ্রন্থ থেকে আমরা আমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাই না। এর আলোচ্য বিষয়

প্রধানত হল নৃত্ত ও নাট্য, বর্ণনা হল উপদেশমূলক, জ্ঞান বা বিচারমূলক নয়। অন্যপক্ষে রত্নাকর গ্রন্থে আমরা সব কিছুই পাই, কারণ গ্রন্থকার বহু পূর্বাচার্যগণের মতসমূহ গ্রহণ করেছেন, বিচার করেছেন ও সজ্জিত করেছেন।

রত্নাকরের পূর্ববর্তী অন্য দুটি গ্রন্থ—বৃহদ্দেশী ও সঙ্গীতমকরন্দ বিষয়ে দেখা যায় যে, পাণ্ডুলিপির কালগত দোষেই হোক্ বা লিপিকারের দোষেই হোক্ অনেক কিছু নষ্ট, স্খলিত, বিক্ষিপ্ত, বা বিকৃত-পাঠযুক্ত হয়ে আছে। অতএব প্রধান ভাবে এদের উপর নির্ভর করা যায় না। সংগীতরত্নাকরকেই প্রাচীনদের চিন্তার শেষ ও উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করে আমরা অগ্রসর হতে পারব।

আয়োজন

প্রথমেই দেখা যাক্—সংগীতের আয়োজন কি রকম।

সংগীত বলতে গীত বাদ্য ও নৃত্য এই ত্রয়ী বা এই তিনের সমন্বয়কেই মনে করা হত। অর্থাৎ, আদর্শ সংগীত ব্যাপারে একসঙ্গে গীত বাদ্য ও নৃত্য হবে এই হল অভিপ্রায়। অভাব পক্ষে গীত ও বাদ্য, অথবা নৃত্য ও বাদ্য এই দুটি যুগ্মও মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ পাওয়া যায় না যে, শুধু গীত বা শুধু বাদ্য বা শুধু নৃত্যকে সংগীত মনে করা হয়।

প্রাচীনদের অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা পদে পদে ব্যাকরণের দাস হয়ে পড়ি প্রাচীনেরা ব্যাকরণের সাহায্যেই চিন্তাসকলকে গ্রথিত ও শ্রেণীবদ্ধ করে গিয়েছেন বলে। যেমন বাদ্য ও নৃত্য এই শব্দ দুটি থেকেই মনে হয় নির্বাচন করে কিছু বাজাতে হবে, নির্বাচন করে কিছু নৃত্ত করতে হবে। অথচ গীত কথাকে তাঁরা 'গেয়' এরূপে বলছেন না। এর অর্থ এই যে, গীত হল প্রধান, এবং গীতের সঙ্গে সমঞ্জস ভাবে বাদন ও নৃত্ত করতে হবে বলেই এ দুটিকে বাদ্য ও নৃত্য বলা হল। এক কথায়, সংগীতের প্রধান অংশ হল গান ; বাজনা ও নাচ হল সহকারী।

যেরূপ অনাদর্শ অবস্থায় বাদ্য ও নৃত্ত হবে, সে স্থলে বাদ্য ও নৃত্তের

মধ্যে কোনটি প্রধান হবে ? সেরূপ স্থলে বাদ্য নৃত্তকে অনুবর্তন করবে অর্থাৎ নর্তক বা নর্তকীর অভিপ্রেত তাল, ছন্দ, ভাব বৃত্তিকে বুঝে তার অনুগমন করবে। বাদকের একটি গুন হল 'পাত্রাভিপ্রেত বাদক' ; পাত্র মানে নর্তক বা নর্তকী ; তার অভিপ্রায় অনুসারে বাদ্য যোজনা করতে দক্ষ হওয়া বাদকের একটি গুণ।

অন্য একটি অনাদর্শ ব্যাপার হল গীত ও বাদ্য। এর সম্বন্ধে দেখা যায় যে কতকগুলি গায়ক ও কতকগুলি বাদক একত্রে মিলিত হয়ে বৃন্দ হয় এরূপ বলা হয়েছে। এই বৃন্দ তিন রকম—উত্তম মধ্যম ও অধম। চারিজন মুখ্য গায়ক (মূলগায়েন) এবং আটজন সমগায়েন সর্বশুদ্ধ বারজন গায়ক, চারজন বংশীবাদক এবং চারজন মৃদঙ্গবাদক এদের একত্রে যে সংঘাত হয় তাকে উত্তম বৃন্দ বলা হয়েছে। সংখ্যায় এর থেকে পর পর কম হলে মধ্যম বৃন্দ ও অধম বৃন্দ হয়। বৃন্দের কিরূপ কার্যকুশলতা বা গুণ হওয়া উচিত, বর্ণিত হয়েছে। একটি কথা বলা হয়েছে—উত্তম বৃন্দ থেকেও সংখ্যাধিক্য হলে তাকে কোলাহল বলে। একথা আমরা খুব স্বীকার করব।

গানের প্রসঙ্গে যদিও ভরত বলেছেন যে, স্ত্রীলোক গান করবে এবং পুরুষগণ বাদ্য করবে, কারণ বামাকণ্ঠ স্বভাবতই মধুর তবুও রত্নাকরে গায়ক ও গায়িকা উভয়েরই প্রসঙ্গ আছে, গুণ-দোষ বর্ণনা আছে।

নৃত্ত ব্যাপারে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই প্রয়োজন আছে ; তবুও সুকুমারতা ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে এবং কতকগুলি ভাবব্যঞ্জনার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নর্তকীরই শ্রেষ্ঠত্ব।

পুরুষ হবেন বাদক, কারণ এই কার্যে এমন অনেক শ্রমসাধ্য হস্তকুশলতা এবং ফুৎকার-চেষ্টার প্রয়োজন হয় যা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অস্বাভাবিক, অশোভন এবং কষ্টকর। আমরা যাকে আসর বিছান বলি, ভরত সেই ব্যাপারকে কুতপবিন্যাস বলেছেন, শার্ঙ্গদেবও ভরতকে অনুসরণ করেছেন।

গায়ক বাদক ও নর্তক এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিই সামাজিকের সম্মুখে কুতপকে অধিকার করে যার যেরূপ স্থান ও আসন পরিগ্রহ করবেন।

এখন বাদ্যগুলি অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রগুলি দেখা যাক্। বাদ্য চারি রকমের। তন্ত্রী বা তারের বাজনা যাকে 'তত' জাতীয় বলা হয়েছে; মৃদঙ্গ-জাতীয় বাজনা যা দিয়ে বিশেষ বিশেষ রকম চপেটাঘাতসমুত্থ ধ্বনি, পাট (আধুনিক বোল্), প্রবন্ধ (অধুনিক পরন্দ) ইত্যাদি নির্গত হয় এবং গীত বা নৃত্যের ছন্দ ও তালকে অনুগমন ও সমৃদ্ধ করা হয়—এর নাম অবনদ্ধ। বংশী বেণু মুরলী ইত্যাদি ফুৎকার-বাদ্যগুলিকে—সুষির এবং কাংস্য (আধুনিক কাঁসি) জাতীয় ধাতুময় ঘন (Solid) বাদ্যগুলিকে 'ঘন' বাদ্য বলা হয়েছে। ঘন বাদ্য দিয়ে গীত ও নৃত্তের মাত্রা ও ছন্দকে অনুবর্তন করে স্পষ্টতর করা হয়।

তত, অবনদ্ধ ইত্যাদি প্রত্যেক রকম বাদ্যের বহু প্রকার ভেদ, নাম ও রূপ বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে বর্ণনা থেকে অনুমান হয়, নামরূপ অবিকৃত হয়ে এখনও কিছু কিছু চলিত আছে, কতকগুলির নাম বদলে গিয়ে আধুনিক নাম হয়েছে, এবং কতকগুলি এখন ভারতবর্ষে চলিত নেই—অন্তত আধুনিক-ভারতীয় বাদ্য-ধারণায়।

বাদ্যের মধ্যে বীণাকে সমধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। বীণাযন্ত্রের নয়টি অঙ্গ কল্পনা করে প্রত্যেক অঙ্গের একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কল্পিত হয়েছে, এবং শেষে বলা হয়েছে 'সর্বদেবময়ী তস্মাদ্ বীণেয়ং সর্বমঙ্গলা'।

কিন্তু বীণা বলতে মাত্র একটি বা একপ্রকার যন্ত্র বুঝায় না। রত্নাকরে একতন্ত্রী, নকুল, ত্রিতন্ত্রিকা, চিত্রা, বীণা, বিপঞ্চী, মত্তকোকিলা, আলাপিনী, কিন্নরী, পিনাকী, নিঃশঙ্কবীণা—এই এগারো রকমের বীণার বর্ণনা আছে। সংগীতমকরন্দে উনিশ (বা কুড়ি) রকমের বীণার কথা আছে, কিন্তু তাদের রূপবর্ণনা নেই। রত্নাকরে প্রত্যেকটির সম্বন্ধে নির্দিষ্ট রূপবর্ণনা আছে—যা থেকে আমরা তুলনা করে দেখতে পারি আধুনিক বীণা প্রভৃতির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য আছে কি না।

একতন্ত্রী ও ত্রিতন্ত্রিকা বীণার নাম থেকে বুঝা যায় যে এগুলি একটি তার ও তিনটি তারের যন্ত্র। নকুল বীণা দুতারের যন্ত্র, চিত্রা সপ্ততন্ত্রী, বিপঞ্চী নবতন্ত্রী। চিত্রা সম্বন্ধে ভরতে আছে, চিত্রা সপ্ততন্ত্রী ও অঙ্গুলি সাহায্যে বাদনীয়। বিপঞ্চী সম্বন্ধে ভরত বলেছেন, এর নয়টি তার এবং কোণ (আধুনিক সেজরাব, জরবা) দিয়ে বাজাতে হবে। চিত্রা ও বিপঞ্চী সম্ভবত আমাদের সেতার ও ও স্বরশৃঙ্গার। 'চিত্রা' শব্দের সঙ্গে পাশ্চাত্য 'সিথারা' (Cithara) এবং এবং পরবর্তীকালে পারসিক 'সেতারা' শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করার যোগ্য। কিন্নরী বীণার বর্ণনা থেকে মনে হয়, আধুনিক উত্তর ভারতীয় দুইটি তুম্বাযুক্ত বীণ্ ও কিন্নরী বীণা একই বস্তু। পিনাকীবীণার বর্ণনা থেকে মনে হয়, পিনাকী আধুনিক 'এসরাজের' পূর্বরূপ হবে।

পনের রকমের বংশী বা বাঁশীর রূপ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া পাব, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী, কাহল, তুণ্ডুকিনী, চুক্কা, শৃঙ্গ ও শঙ্খের বর্ণনা, এবং এদের ধ্বনির অনুকৃতিসূচক বোলও ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট ভাবে দেওয়া হয়েছে। মুরলীর বর্ণনায় পাই, পরিমাণে দুই হাতের অধিক, মুখরন্ধ্রসমন্বিত স্বরের জন্য মাত্র চারটি ছিদ্র। মধুকরীর বর্ণনা পড়লে, বিশেষত তাম্রনির্মিত বিশিষ্ট মুখরন্ধ্র ব্যাপারের কথা পড়লে মনে হয় আধুনিক পাশ্চাত্য ক্লারিওনেট-জাতীয় বাদ্য। কাহলের লক্ষণ এই—তাম্র, রজত বা কাঞ্চন নির্মিত, ধুতুরার ফুলের মত এর বদন; তিন হাত দীর্ঘ। তুণ্ডুকিনীর বর্ণনায়—দৈর্ঘ্যে দুই হাত, এর শব্দানুকরণ তুরুতুরু; সাধারণত একে তিত্তিরীও বলা হত। শৃঙ্গের যথোচিত বর্ণনার পর বলা হয়েছে—এর অনুকৃতি শব্দ 'তুথু'। শঙ্খের বর্ণনার পরে অনুকৃতি শব্দ বলা হয়েছে "হুং ভূং থো।" প্রকৃতই শঙ্খের বোল যদি কিছু করতে হয় তা হলে ঐরূপ একটা কিছু হবে। অনুকৃতিসূচক শব্দ বা বোল সম্বন্ধে সাধারণ কথা এই—যেগুলিতে একাধিক স্বর (সুর, সরগম ইত্যাদি) নিষ্পন্ন হয় সেগুলির বোলের চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ তারা গীত-সমুখ স্বর

সকলকেই অনুকরণ করবে ; আর সেই অনুকরণের যথারূপতাই হল ঐ বাদ্যের গুণ। কিন্তু যে-সকল বাদ্যের ধ্বনি দিয়ে গীতান্তর্গত স্বরের অনুকরণ সম্ভব নয়—যেমন কাহল, তুণ্ডুকিনী, শৃঙ্গ, শঙ্খ ইত্যাদি, সেগুলির পক্ষে প্রত্যেকের নিজস্ব ধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও সুচারুতার দিকে লক্ষ্য রেখে অভ্যাস করতে হবে ; সুতরাং তাদের স্বাভাবিক ও সুচারু ধ্বনির অনুকৃতি-শব্দ জানা প্রয়োজন।

মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্য সম্বন্ধে প্রথমেই একটি কথা মনে আসে। অনেকেই জানেন আধুনিক মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, তবলা, বাঁয়া এমন কি ঢাক ও ঢোলের বাদ্যের ধ্বনিসূচক বোল বা মুখের শব্দ দিয়ে অনুকরণ-পদ্ধতি ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত আছে ; অনুকৃতি-শব্দ—যেমন ধা, ঝাঁ, তেটে, তেরেকিট, ধুমাকিট প্রভৃতি চেষ্টা। পৃথিবীর মধ্যে এক ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনও স্থান নেই যেখানে এরূপ বিচিত্র অনুকরণ-চেষ্টার সাহায্যে একটি কলাবিদ্যা আগাগোড়া সংরক্ষিত আছে। অন্য কোনও দেশে যে কোনও কালে ঐরূপ ছিল তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই না। এই বোলগুলি—যাকে রত্নাকরে 'পাট' বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে মহাদেবের পাঁচটি মুখ থেকে কতকগুলি প্রাথমিক ধ্বনিরূপে নির্গত হয়েছিল এবং মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দিকেশ্বর কতকগুলি পাটান্তর যোজনা করেছিলেন ; এরূপ রত্নাকরে বর্ণিত হয়েছে। পরে এসকলকে বিস্তারিত করে পরিপাটী ও প্রবন্ধ (আধুনিক পরন্দ্) করা হয়েছে ; এদের যথাযথ বর্ণনা ও প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ আছে। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রেও এগুলি পাওয়া যায় যদিও সামান্য প্রভেদ আছে। যাই হোক্, আধুনিক মৃদঙ্গ পাখোয়াজ, ঢোলক, তবলা প্রভৃতির বোলের মধ্যে আমরা এই পাট, পরিপাটী, প্রবন্ধ সকল পাই ; কিছু নাম পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু ঘটনা একরূপই আছে।

মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্যের নানারকম ভেদ পাওয়া যায়—যেমন পটহ (মার্গ ও দেশী দুইরূপ), উদ্দলী, কবল, হোড্ডুক, ডক্কা, মর্দ্দল, ত্রিবলী, করটা, ঢক্কা ইত্যাদি। 'পটহ' একরূপ বৃহৎ ঢোলকবিশেষ, কিন্তু একে আধুনিক 'ঢাক'

বলা যায় না। এর বর্ণনা সংক্ষেপে—দৈর্ঘ্যে আড়াই হাত, পরিধি (মধ্যদেশের পরিমাণ), ষাট অঙ্গুলি, মধ্যদেশ পৃথুল অর্থাৎ মোটা ; দক্ষিণ মুখ (ডানহাতের দিকে) সাড়ে এগার অঙ্গুলি এবং বাম মুখ সাড়ে দশ অঙ্গুলি ; দক্ষিণ মুখ লৌহ-বলয় ও বাম মুখ মৃন্ময়-বলয় দ্বারা বেষ্টিত হবে ; এই বলয় দুইটিকে চর্মদ্বারা অবগুণ্ঠিত করে তার মধ্যে সাতটি ছিদ্র করতে হবে এবং সেই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে বন্ধনী ও বাজময় কীলক থাকবে। খদির-কাষ্ঠ দিয়েই উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র হবে। মোটের উপর বঙ্গদেশের বিবাহোৎসবাদিতে প্রচলিত ঢোলক অনেকটা এইরূপ। অন্যান্য প্রত্যেক যন্ত্রের বর্ণনা আছে। মর্দল, মৃদঙ্গ ও মুরজ একার্থনামা শব্দ। এই যন্ত্র রক্তচন্দন বা খদির-কাষ্ঠের হওয়া উচিত। গ্রন্থকার বলেছেন—"এবং জলধরোধ্বানগম্ভীরো ভবতি ধ্বনিঃ"—অর্থাৎ এর ধ্বনি মেঘধ্বনির মতই গম্ভীর হবে। কালিদাসের মেঘদূতে এই মুরজধ্বনির বারবার উল্লেখ আছে। এই সকল বাদ্যের সাধারণ পাট অবপাট প্রবন্ধ কল্পিত হয়েছে, এবং বিশিষ্ট এরূপ পাটাদি কল্পিত হয়েছে, যা মাত্র একটিতেই হয়, অন্যটীতে হয় না।

উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্র ছাড়া অন্যান্য নানারূপ বাদ্যও সঙ্গীতে ব্যবহার্য মনে করা হত। যথা ঘটবাদ্য, ঘড়স, ঢবুস, কুড্ডুকা, কুড়ুবা, রুঞ্জাল, ডমরু, মণ্ডি, ডক্কা, ডক্কু, সেল্লুকা, ঝল্লরী, ভাণ, ত্রিবলী, দুন্দুভি, ভেরী। এদের মধ্যে ঝল্লরী এখনও ব্যবহৃত হতে দেখা যায় মধ্য ও পশ্চিম ভারতে 'লাউনি' নামক গীতের সঙ্গে এবং কদাচিৎ গজলের সঙ্গে গায়ক নিজেই একে বাজান।

ঘন বাদ্যের প্রসঙ্গে কাংস্য (আধুনিক কাঁসি) ঘণ্টা, ক্ষুদ্র ঘটিকা জয়ঘণ্টা, কম্রা, শুক্তিবাদ্য পট্টবাদ্য প্রভৃতি নাম ও তাদের লক্ষণ, প্রয়োগ বর্ণিত আছে।

এই সকল বাদ্য-সমাবেশ দেখে মনে হয়—প্রাচীনেরা যেমন গায়কদের বৃন্দ কল্পনা করেছেন, সেই বৃন্দেরই উপযুক্ত ধ্বনি সমাবেশকেই কল্পনা করেছেন। তাঁরা উন্মুক্ত ধ্বনিকেই সমাদর করতেন। উন্মুক্ত ধ্বনি অর্থাৎ খোলা আওয়াজ, চাপা আওয়াজ নয়। আধুনিক মৃদঙ্গ-বাদকদের চলিত পরিভাষায়

'খুলি আওয়াজ' ও 'মুদি আওয়াজ'—দুরকম চেষ্টা আছে। দিল্লী লক্ষ্ণৌ ঢঙের মৃদঙ্গ-বাদ্য বা তবলা-বাদ্যে মুদি আওয়াজই প্রধান ও বিশিষ্ট; বারাণসী বৃন্দাবন মথুরা ও বঙ্গদেশে খুলি ঢংই প্রধান ও বিশিষ্ট।

গানের অনুকরণ বিষয়ে বংশীধ্বনিকেই সর্বোত্তম মনে করা হত যদিও বীণার প্রশংসা করা হয়েছে। বাদ্যাধ্যায়ের একস্থানে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

বংশবীণাশরীরাণি ত্রয়োঽমী স্বরহেতবঃ।
ললিতো মধুরঃ স্নিগ্ধস্তেষু বংশঃ প্রশস্যতে॥
বংশবীণাশরীরাণামেকী ভাবেন যো ধ্বনিঃ।
তত্র রক্তিবিশেষস্তু প্রমাণং বিবুধা বিদুঃ॥

এর সরলার্থ:—বংশী, বীণা ও শরীর (কণ্ঠ) এই তিনই স্বরের (প্রকাশের) হেতু; এদের মধ্যে লালিত্য, মাধুর্য ও স্নিগ্ধতাগুণে বংশীরই (সমধিক) প্রশংসা। বংশীধ্বনি, বীণাধ্বনি ও কণ্ঠধ্বনি—এই তিনের একত্র সমন্বয়ে যে ধ্বনি—তাহা বিশিষ্টরূপ রক্তিপ্রদ (রঞ্জনাকর) হয় এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন।

এখন দেখা যাক, গীত বাদ্য ও নৃত্ত বিষয়ের আন্তরিক ঘটনাগুলিকে প্রাচীনেরা কি রকম অনুশীলন করেছিলেন এবং কিরূপ চিন্তা করতেন। কোনও কৃত্রিম ব্যাপার বা সংঘটনাকে অনুশীলন না করলে সেই ব্যাপারকে উৎকর্ষরূপে প্রস্তুত করা, বা সংগঠন করা অসম্ভব; যেমন সন্দেশকে সুভোগ্য রূপে পেতে হলে ছানা ও চিনিকে জানতে হবে, উৎকৃষ্ট ছানা ও উৎকৃষ্ট চিনি কিরূপ বস্তু, কেমন করে সংগ্রহ করতে হয় প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এবং ছানা ও চিনির পরস্পরের পরিমাণ সম্বন্ধ ও তাদের পাকপ্রণালী বিষয়ে অনুশীলন করতে হয়।

সংগীত ব্যাপারের মূলে যে একটা স্বাভাবিক চেষ্টা আছে, এবং গান মাত্রেরই যে প্রভাব আছে, এই কথাগুলি প্রকারান্তরে বলা হয়েছে, যেমন—গানের দ্বারা সর্বদেবতাকে সন্তুষ্ট করা যায়; গোপীপতি মুরলীবাদনে এবং সরস্বতী বীণাবাদনে

আসক্ত ; ব্রহ্মা সামগীতরত ; সুতরাং—অন্য যক্ষ গন্ধর্ব, দেব দানব ও মানবের পক্ষে আসক্তি ত হবেই। জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত নয়, এমন যে শিশু সেও গান শুনে কান্না ভুলে যায়, আনন্দিত হয়ে ওঠে। সামান্য ব্যাধ বাঁশী বাজিয়ে বনচর তৃণাহারনিবিষ্ট মৃগশিশুকে মোহিত করে।

উৎকর্ষ

যাবতীয় সংগীতকে দুই রকমে ভাগ করা হয়েছে তার প্রয়োজনসিদ্ধির দিক দিয়ে। একটি হল মার্গ, অন্যটি দেশী। ব্রহ্মা মার্গ-সংগীতকে চতুর্বেদ থেকে আহরণ করেছেন, ভরত তাকে নির্বাচন করে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন যাতে সংগীত সুশ্রাব্য, মনোরম ও উপাদেয় হয়। এই মার্গ-সংগীতের অন্য একটি অংশ যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হত, দেবতাদের পূজায় অনুষ্ঠিত হত এবং কতকগুলি আভিচারিক কার্যের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিল ; এই অংশকে আভ্যুদয়িক সংগীত বলা যায়। ভরত যে সংগীতের উৎকর্ষ গ্রহণ করে প্রয়োগযোগ্য করেছেন তাকেই সাধারণ ভাবে মার্গ-সংগীত বা উৎকৃষ্ট সংগীত বলা যাবে। আভ্যুদয়িক সংগীতকে গোপনীয় রাখা হয়েছে ; যেমন চতুর্বেদকে অনধিকারী ব্যক্তির অনুশীলনচেষ্টা থেকে আড়ালে রাখা হয়েছে। বলাই বাহুল্য ব্যাধ যে সংগীত দিয়ে মৃগকে বশ করে—সেও আভ্যুদয়িক সংগীতের অন্তর্গত, সুতরাং একেও একরকম মার্গ-সংগীত মনে করা যায়।

মার্গ-সংগীত সম্বন্ধে আরও একটি বিশিষ্টতা এই যে, নিজস্ব প্রভাবে এই সংগীত তার কার্য সিদ্ধ করে অর্থাৎ মনোরঞ্জন করে বা যজ্ঞীয় দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলকে লাভ করায় বা অন্য কোনও আভিচারিক ফল উৎপাদন করে।

প্রাচীনগণ দুরকমের ফল কল্পনা করতেন—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল। যেমন প্রাতে বিশেষত গ্রীষ্মকালে গঙ্গাস্নান করলে তার দৃষ্ট ফল হল তৎক্ষণাৎ শরীরের তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ এবং অদৃষ্ট ফল হল কোনও পারলৌকিক ও বিশেষ মঙ্গল। অধিকাংশ কাম্য ও কৃত্রিম কর্মপক্ষে এই রকমে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল

কল্পনা করা হত এবং এখনও হয়। সংগীত সম্বন্ধেও—মার্গ-সংগীতের দৃষ্ট ফল হবে—মনোরঞ্জন রসভাবাদির সৃষ্টি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও দর্শয়নেন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধন এবং আভিচারিক ফলবিশেষ। মার্গ-সংগীতের অদৃষ্ট ফল হবে—বিশেষ পারলৌকিক মঙ্গলসাধন। প্রাচীনগণ যে এইরূপ চিন্তা করেছেন—তার যথেষ্ট প্রমাণ সংগীতরত্নাকরে আছে। অদৃষ্ট ফল যাই হোক ভরতপ্রযুক্ত উৎকর্ষ-সংগীত বিষয়ে যে চিন্তাধারা আমরা তাকেই অনুসরণ করব।

মার্গ-সংগীত, তথা উৎকর্ষ-সংগীতের সঙ্গে তুলনা করে অন্য চিন্তা হল 'দেশী' সংগীত সম্বন্ধে।

যে গীত বাদ্য ও নৃত্ত দেশগত, কালগত রুচির বশে লোকজনের মনোরঞ্জন করে, সেই সংগীতকে দেশী সংগীত বলা হয়েছে। উৎকর্ষ-সংগীতের চিন্তা এবং তার বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে দেশী সংগীতও বুঝা দরকার।

প্রাচীনগণ যদিও উৎকর্ষ সংগীত বিষয়ে নানা রকমের নিয়ম ও প্রয়োগ-পদ্ধতি চিন্তা করে গিয়েছেন তবুও তাঁরা জানতেন যে পরিকল্পনাকার বা শিল্পী সব ক্ষেত্রে, সব সময়ে এই নিয়ম-নিয়ন্ত্রণকে নিখুঁৎভাবে অনুসরণ করতে পারবে না; অর্থাৎ মার্গ-সংগীতের আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না। এজন্য পারবে না যে সংগীত যাদেরকে পরিবেশন করা হচ্ছে তাদের রুচি হয়ত ইতিপূর্বেই গড়ে উঠেছে এবং সেই রুচির আনুকূল্যেই উৎকৃষ্ট বস্তু মনোরঞ্জক হবে, রুচির প্রতিকূলতায় উৎকৃষ্ট বস্তুও ব্যক্তির বা সমাজের মনকে লোলুপ করতে পারবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বস্তু বা বিষয় পরিবেশন করার সময়ে যদি কিছু নিয়ম উল্লঙ্ঘন করতেই হয়—তাহলেও তাতে দোষ নেই, কারণ—আসলে উৎকৃষ্ট বস্তুই ত পাতে পড়ল।

বিশেষত দেখা যায় যে, তাঁরা সংগীত সম্বন্ধে যে-সকল মুলগত তত্ত্ব প্রতিপাদিত করে গিয়েছেন সেই তত্ত্বগুলি সবই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। যেমন দুইটি স্বরের কোনও একরূপ বিশেষ সম্বন্ধ হলে তারা বিশেষ ভাবে শ্রুতিসুখকর হয়, যথা সংবাদী সম্বন্ধ, কোনও দুইটি স্বরের অন্যরূপ বিশেষ ব্যবধান বা সম্বন্ধ হলে

শেষের স্বরটি দীপ্ত বা উজ্জলরূপে প্রকাশ পায় অন্যরূপ সম্বন্ধ হলে স্বররূপকে আয়ত বা বিস্তৃত বলে বোধ হয় ইত্যাদি। এই স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ ও তাদের প্রভাবগুলি স্বরবস্তুর নিজস্ব আন্তরিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মার্গ-সংগীতই হোক বা দেশী সংগীতই হোক শিল্পী স্বভাববশেই এই নিয়মের অনুকূলে প্রবৃত্ত হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই সকল মানুষের পক্ষে প্রভাবও একরূপ হবে। প্রত্যেক মানুষের অনুভব ও মনের রাজ্যের এক অংশ হল বিশ্বরূপ, সেখানে দেশকালপাত্রগত কোনও ভেদ নেই। সংগীতের পক্ষেও সেরূপ কতকগুলি নিয়ম ধর্ম আছে যা প্রত্যেক মানুষের উপর সাধারণ ভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। এই হল গোড়ার কথা।

আবার এও দেখা যাচ্ছে—দেশকালপাত্রভেদে মানুষ বিশ্বরূপ ভূমিকার উপর ব্যক্তিগত বা দেশগত রুচির আবরণী প্রস্তুত করে ফেলেছে। শুধু প্রস্তুত করা নয় তাকে অভ্যাস করে এমন মজবুত ও পাকা করেছে যে, জিনিষ আসলে যতই ভাল, স্বভাবসিদ্ধ বা সুন্দর হোক্ না কেন সেই আবরণীর ছাঁচের মধ্যে দিয়ে তৈরি না করলে সেই দেশের বা সেই ব্যক্তির গ্রাহ্যই হয় না, মনোরঞ্জন তো দূরের কথা।

মোটের উপর দেখা যাচ্ছে, দেশী সংগীতের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, যদিও একে অভিব্যক্ত করতে গিয়ে শিল্পী সনাতন নিয়মের কিছু কিছু ডালপালা কেটে ফেলেন। প্রাচীনেরা এর প্রয়োজনীয়তাকে বুঝেছিলেন বলেই শ্রেণীকরণে একে স্থান দিয়েছেন, এবং রত্নাকর ও বৃহদ্দেশী এদের বিস্তৃত আলোচনা করে সম্মান বৃদ্ধিই করেছে। একটি কথা মনে রাখতে হবে —দেশী সংগীত মানে সংগীতের অপকর্ষ নয় বা সংগীতের আগাছা নয়।

মার্গ-সংগীতের অন্তর্গত আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক সংগীত ও তার প্রয়োগ সকলকে গোপনীয় রাখা হয়েছে। শেষেরটির সঙ্গে গান্ধার-গ্রাম নামক ব্যাপার জড়িত ছিল, এই গান্ধার-গ্রামকে লোকচক্ষু থেকে ইচ্ছাপূর্বক গোপনে অন্তরালে রাখা হয়েছে। আমরা যদি মনে করি যে প্রাচীন কালে

কোনও সময়ে—অধিকারী সংগীত-সাধক এই আভিচারিক সংগীতের সাহায্যে অঘটন ঘটাতে পারতেন তা হলেই সিদ্ধান্ত হয় যে, সাধারণের জ্ঞানগম্য না করে একে গোপন করে ভালই হয়েছে ; কারণ সমাজের অধিকাংশ লোকই প্রবৃত্তি মার্গের পথিক এবং এই বিদ্যাংশ আপামরসাধারণের জ্ঞানের বিষয় হলে সমাজের অমঙ্গলই হবে।

প্রকৃতই ঐ রকম একটা চিন্তা ছিল বলে নানা কারণে মনে হয়। রত্নাকরে মূর্চ্ছনা-তান প্রকরণে চৌরাশী তানের নাম ও রূপ সংকেতের সাহায্যে বর্ণিত আছে। সংকেত বলি এজন্য যে গ্রাম নামক ব্যাপারটিই মূলে অঙ্কশাস্ত্রানুযায়ী লক্ষণসিদ্ধ জাতিকরণের উপর নির্ভর করে এবং জাতিকরণ নির্ভর করছে ন্যায়শাস্ত্রের একটি বচনের উপর—নিত্য ও অনেক সমবেতত্বই জাতি। যিনি এই জাতিতত্ত্ব বুঝেন মাত্র তিনিই গ্রামরহস্যকে জানতে পারেন এবং যিনি গ্রামকে জানেন, তিনি ষড়জ মধ্যম ও গান্ধার-গ্রামকে মূর্ত করতে পারেন। যাবতীয় আভিচারিক যজ্ঞ গান্ধার-গ্রামের অপেক্ষা করে ; সুতরাং গান্ধার-গ্রামকেই গোপন করতে হয়েছে। বায়ুপুরাণে গান্ধার-গ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে ; তার থেকে আমরা জানতে পারি যে একটি বিশেষ জাতির সাহায্যে (এগুলি এক-একটা সুর বা scale বৈ আর কিছু নয়) নিষাদেরা পক্ষীদিগকে স্তম্ভিত ও ইচ্ছামত আবদ্ধ করতে পারত। সংগীত-মকরন্দে বলা হয়েছে—শান্তিপুষ্টি অভিচারাদি কর্মে ঔড়ুব (পাঁচস্বরের স্বরবিন্যাস) রাগগুলিই প্রশস্ত। রত্নাকরেও শান্তিকৃৎ, পুষ্টিকৃৎ, বশীকরণ প্রভৃতি তানের নাম পাওয়া যায়। সংগীতমকরন্দে ও রত্নাকরে সাংগীতিক ব্যাপারের সঙ্গে গোত্রকর্তা ঋষি, ছন্দ ও বিনিয়োগ প্রভৃতিকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। যক্ষ গন্ধর্ব বিদ্যাধর কিন্নর প্রভৃতি দেবযোনিগণ এই গান্ধার-গ্রাম-রহস্য ও আভিচারিক সংগীতে পারদর্শী ছিল—এ কথা পুরাণ মহাকাব্য ও ও কাব্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। মেঘদূত কাব্যে উত্তরমেঘের মধ্যে যক্ষপত্নীর বিশেষ অবস্থা বর্ণনাবসরে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর স্বামীর

গোত্রাঙ্কিত মূর্চ্ছনাকে ব্যবস্থিত করে বীণাযন্ত্রে ঐ মূর্চ্ছনা অভিব্যঞ্জিত করবেন এমন সময়ে স্বামীর স্মরণে সন্তপাতিত অশ্রুবিন্দু সকল বীণার তারকে নিষিক্ত করায় তাকে মার্জিত করতে হল; ফলে সেই তার শিথিল ও অব্যবস্থিত হয়ে যাচ্ছিল এবং ঐ মূর্চ্ছনার প্রকাশ সম্ভব হল না। মল্লিনাথ (টীকাকার) বলছেন—গন্ধর্বগণ গান্ধার-গ্রামরহস্য অবগত ছিল; সেই গান্ধার-গ্রামের মূর্চ্ছনাই উদ্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু গোত্র বা নাম কেন প্রয়োজন হবে মল্লিনাথ বলেন নি। এমন হতে পারে যে, ঐ প্রকার রহস্যময় সংগীত গোত্র বা নামের বা উভয়েরই অপেক্ষা করত।

উদাহরণ বিস্তার করে লাভ নেই। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাব্যাদিতে এ রকম বহু মন্তব্য আছে যা আমাদের কাছে অদ্ভুত বলেই মনে হয়; এবং প্রাচীনদের চিন্তাসূত্রকে অনুসরণ না করলে উদ্ভট, কষ্টকল্পনা—না হয় একটু শ্রদ্ধা করে কবি-কল্পনা বলে বোধ হয় এবং আমাদের অনুসন্ধান এই বুদ্ধিতেই নিবৃত্তি লাভ করে।

যাই হোক, এই রকম ব্যাপার সম্ভব ছিল এরূপ চিন্তা করা হয়েছে। যাঁরা এই সকল ধারণার প্রতিষ্ঠা বা তাদিগকে নিয়ন্ত্রিত বা গোপনীয় করে গিয়েছেন তাঁরা ছাড়াও সাধারণ লোকসমাজে কিংবদন্তী ও কথার বাহনে, ঐরূপ ধারণা অল্পবিস্তর বিকৃত হয়ে প্রসর্পিত হয়েছিল এবং এখনও ঐরূপ ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। যেরূপ ঘটনা ঘটলে ঐ সকল ধারণা দৃঢ় হয় সেরূপ ঘটনা সম্প্রতি বিরল। কিংবদন্তী আছে, বাদশাহ আলাউদ্দিনের সমসাময়িক বৈজু নামে সিদ্ধ মহাপুরুষ গানক্রিয়া দ্বারা বনের পশুকে স্তম্ভিত ও মোহিত করতে পারতেন, প্রলোভিত করে আকর্ষণ করতে পারতেন, এমন কি প্রস্তরকেও দ্রবীভূত করেছিলেন। আকবর বাদশাহের সমসাময়িক সাধু হরিদাসস্বামীর ক্ষমতা সম্বন্ধেও ঐ রকমের জনশ্রুতি বা কাহিনী পাওয়া যায়। এগুলি নিছক কল্পনা হলে আরও অনেক সাধুর নামে আমরা ঐরূপ গল্প পেতাম, এবং প্রসিদ্ধ গায়কমাত্রেরই জীবনী ঐ

প্রকার গল্প দিয়ে অতিরঞ্জিত হয়ে উঠত। বাস্তবিক ঐ গল্পের মূলে কতখানি সত্য আছে, এবং কতখানি মিথ্যা দিয়ে সত্যকে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু এও মনে হয় 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'—জনশ্রুতি একেবারে অমূলক নয়।

এই বিদ্যার গোড়ার তত্ত্বকে, প্রাচীন আচার্যগণ গোপনীয় করে গিয়েছেন। কিন্তু যেমন একটি ডুবন্ত গাছের উপরকার পাতাগুলি জলের উপরে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত, বিশ্লিষ্ট ভাবে দেখা যেতে থাকে সেইরকম আধুনিক কালেও এর কিছু অংশও ঐ পাতাগুলির মত বিচ্ছিন্ন, নিরুদ্দিষ্ট হয়ে কালস্রোতে ভাসতে দেখা যাচ্ছে। এই পাতাগুলি আর কিছুই নয়, আধুনিক তথাকথিত রাগরাগিণী সকল। এইগুলি যে বিক্ষিপ্ত ও নিরুদ্দিষ্ট তার প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে সংগীতমকরন্দ থেকে। এই গ্রন্থকে রত্নাকরের পূর্ববর্তী এবং খৃষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীর পরবর্তী এরূপ মনে করা হয়। মকরন্দ গ্রন্থে এদের নিয়ে নানা রকম তাসের খেলা দেখান হয়েছে। কোনও মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিণী, কোনও মতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, কোনও মতে আট রাগ চব্বিশ রাগিণী। প্রায়ই নামের ঠিক নেই, অর্থাৎ কখনও ঋতুবাচক নাম, কখনও বা দেশবাচক কখনও বা সাধারণ, কখনও বা অসাধারণ নাম। একই সময়ে ও বিধিবদ্ধভাবে শ্রেণীকরণ হয়ে থাকলে এরূপ নাম-বিপর্যয় হত না। রাগিণী শব্দটি ব্যাকরণের অপেক্ষা রাখেনি। এর স্রষ্টা কে জানা যায় না। মকরন্দে দেখা যায়, ক্লীব রাগও আছে। কোনও আভ্যুদয়িক প্রাচীন ধারণাসূচক নাম আছে, যেমন ধনাশ্রী (ধনশ্রী), ধানশ্রী (ধান্যশ্রী), মঙ্গল, কল্যাণ ইত্যাদি। যদি-বা প্রাচীন নাম পাওয়া যায়, দেখা যায় তার রূপ বদলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হয়েছে, যেমন ভৈরব ও শ্রীরাগ। 'শ্রী' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ; কি করে পুংলিঙ্গ রাগবাচক হ'ল বুঝা যায় না।

ঋক্ ও সামবেদের বহুপরবর্তী ঋক্ প্রাতিশাখ্য (কমপক্ষে খৃস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী), বৃহদ্দেবতা, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, সামবিধান ব্রাহ্মণ, পুষ্পসূত্র,

সামতন্ত্র, সামপরিভাষা, মাণ্ডুকীশিক্ষা, ধারণালক্ষণ ও নারদশিক্ষা নামক গ্রন্থগুলির আলোচনা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ অর্থ ও ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন। শেষোক্ত চারিখানি ব্যতীত অন্যগুলি খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃস্টাব্দারম্ভ কালের মধ্যেই রচিত হয়েছিল এরূপ অভিমত পণ্ডিতগণের কৃত আলোচনা থেকে উদ্ধার করা যায়, যদিও এ বিষয়ে সামান্য মতভেদ আছে। সামিকগান সকলের মধ্যে উহ, উহ্য ও রহস্য নামে তিনটি শ্রেণী পাওয়া যায়। রহস্যের অর্থ গোপনীয়। এদের উচ্চারণ ও স্বরসংযোজনা সম্বন্ধে যা কিছু আদেশ-উপদেশ পাওয়া যায় সবই রহস্যময়; অর্থাৎ অনধিকারী ব্যক্তি যেন কিছু উদ্ধার করতে না পারে এরূপ গোপনীয় ও প্রহেলিকাসমাচ্ছন্ন। এ সকল তথ্য নির্বিশেষে রহস্যময় মার্গ-সংগীতের চিন্তার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে। যদিও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র এবং সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে এই রহস্য-ভাণ্ডারের তিনটি চাবি রক্ষিত আছে তবুও আমি বলতে পারি যে, এগুলি অত্যন্ত সুরক্ষিতই আছে এবং নাট্যশাস্ত্র ও রত্নাকর পৃথিবীতে যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই চাবিগুলিতে মরচে ধরবে না। রত্নাকরের পরবর্তী কালের কোনও সংগীতগ্রন্থে এ সকল রহস্যের প্রসঙ্গ নেই, সুতরাং সমাধানেরও প্রয়োজন নেই। রহস্যময়, বস্তুতান্ত্রিক সংগীত সম্বন্ধে বলা যায় রত্নাকরের পর অন্ধকার।

এই সকল সংগীতগ্রন্থ এবং পুরাণাদি সাহিত্যে যে সকল অসম্বদ্ধ অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান হয়, অন্তত সন্দেহ হয়, 'রাগ' ব্যাপার এবং সে বিষয়ে বিধিবদ্ধ চিন্তা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালেই হয়ে গিয়েছে। এগুলিকে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত; পরবর্তী অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব কোনও কালে ঐ উদ্দেশ্যকে বর্জনীয় মনে করে বিশিষ্ট ব্যবহারের লোপসাধনের চেষ্টা হয়েছে। বিশেষ উদ্দেশ্য লুপ্ত বা গোপনীয় হলেও রাগ-অবয়ব বা স্বরবিন্যাস অবলম্বন করে সংগীতজ্ঞ ও সংগীতচিন্তক বহু ব্যক্তি নানারূপ অনুশীলন করেছেন। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন রুচির সাধকদের সাধনার

ফলে ব্যক্তিগত বহু মত সম্ভব হয়েছিল। এই সকল ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত মত বা চেষ্টা বিভিন্নরূপ হলেও সমগ্রভাবে এগুলিকে লৌকিক সংগীতের উপকরণরূপে চিন্তা ও ব্যবহার করা হয়েছে। রূপান্তর পরিণতির পর অভিনব শ্রেণীকরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। পরিশেষে ধ্যানকল্পনা ও কালনির্দেশের নিয়ম সকল ক্রমশ সংগীত-গ্রন্থের মধ্যে এসে পড়েছে। এই পরিশেষকালের সূচক একখানি প্রাচীনগ্রন্থ হল নারদকৃত সংগীতমকরন্দ যার মধ্যে এ বিষয়ে নানা মত পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য, সংগীতমকরন্দ সংকলনজাতীয় গ্রন্থ। আর এইরূপ পরবর্তীকালের অন্য একখানি গ্রন্থ সংগীতদর্পণ।

যদিও রাগ-রাগিণী কল্পনার মূলে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায় তবুও প্রাচীনকালের 'রাগ'-চিন্তার সঙ্গে এর জন্য-জনক সম্বন্ধ রয়েছে এবং অত্যাধুনিক কালে এই চিন্তা ক্রমশ একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। এই কারণে অর্থাৎ প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের একটি যোগসূত্র রয়েছে বলেই এই চিন্তা উত্তরোত্তর একটি বেগ সঞ্চয় করতে পেরেছে এবং সেই বেগের জন্যেই স্রোতের মধ্যে বিচিত্র তরঙ্গের সৃষ্টি হতে পেরেছে; যেমন বৈজু বাওরা ও তানসেনের সময়ে ধ্রুবপদ গান, পরবর্তী কালের 'আলাপ' এবং খেয়ালগান। অন্যদিকে কবি ও ভাবুকের মনে এই সকল চিন্তা এমন এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে যা থেকে রাগ-রাগিণী, সহচর-সহচরী প্রভৃতি কল্পনাগুলি ধ্যানমূর্তি পেয়েছে। সংস্কৃতভাষায় রচিত সুন্দর ও সুললিত কবিতায় এই সকল ধ্যানরূপ পাওয়া যায়; এদের বয়স চার-শ বৎসরের বেশী নয়। নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সংগীতরত্নাকর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এদের উদ্ভব হয়েছে বলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাই হোক্, মার্গ-সংগীত চিন্তার অন্তর্ভুক্ত এই অংশকে এখন ছেড়ে দিয়ে রত্নাকরে ভরত-প্রযুক্ত উৎকর্ষসংগীতের চিন্তা কিরূপ ছিল দেখা যাক্।

উৎকৃষ্টসংগীতরূপ সংঘটনাকে পেতে হলে গীত বাদ্য ও নৃত্ত এই তিনটির প্রত্যেকের উৎকর্ষ ত চাইই, অধিকন্তু তিনটিকে কোনও একটি সুন্দর পরিকল্পনা

দিয়ে যথাযোগ্য রূপে গ্রথিত করতে হবে। যেন-তেন প্রকার গীত বাদ্য ও নৃত্ত হবে, কোনও সুন্দর পরিকল্পনা থাকবে না, অথচ উৎকৃষ্ট সংগীত হবে এরূপ চিন্তা করা অসংগত।

গীত

'গীত'-এর সংজ্ঞা প্রতিপাদন কল্পে যে চিন্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তার মধ্যে দেখি চিন্তা-সূত্রটি একইরূপ, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের ও রত্নাকরের বুনানি ভিন্নরূপ। সূত্রটি এই যে গীতব্যাপারের মধ্যে, স্বর-সমাবেশ তাল ও পদ থাকবে। রত্নাকর-প্রণেতা একই কথা প্রকারান্তরে বলেছেন। এঁর চিন্তাজাল এরূপভাবে প্রসারিত যে, এর মধ্যে গোপনীয় সংগীতব্যাপার, ভরতপ্রযুক্ত মার্গগীত ব্যাপার এবং দেশীগীত ব্যাপার এই তিনটিকেই লক্ষণ দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। চিন্তাজালটি সংক্ষেপে এইরূপ :

যাবতীয় গীতের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ বা অংশ হল রঞ্জক স্বর-সমাবেশ। স্বরগুলি প্রত্যেকটি সুখশ্রাব্য হলেও এদের বিশিষ্ট সমাবেশ মাত্র রঞ্জনাকর হতে পারে ; অন্য এমন সমাবেশ হতে পারে যা রঞ্জনাকারক নয় ; এই অরঞ্জক সমাবেশ দিয়ে 'গীত' হয় না।

কিন্তু রঞ্জক স্বর-সমাবেশ ছাড়া বাক্য পদ ইত্যাদি ব্যাপারও রয়েছে। 'আভ্যুদয়িক, তথা গোপনীয়' গীত ব্যাপারে বিশিষ্ট এক প্রকার মন্ত্রজাতীয় বাক্যপদ প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই বাক্যপদাদিই ঐরূপ গীতের প্রধান অংশ নয়, এবং এইরূপ বাক্যপদ ভরতপ্রযুক্ত প্রকাশ্য সাধারণ গোচরীকৃত যে উৎকৃষ্ট গীত বা গান, তাতে প্রয়োজন হয় না ; এবং দেশীগীত ব্যাপারেও প্রয়োজন নয়, সুতরাং ঐরূপ বাক্যপদকে গীতের পক্ষে সাধারণ বা প্রধান লক্ষণ মনে করা যেতে পারে না।

সেইরূপ উৎকর্ষ প্রকাশ্য গীত ব্যাপারের যে বাক্যপদ তা দিয়ে গোপনীয়, মন্ত্রসম্বলিত গীত হতে পারে না। সুতরাং এরূপ বাক্যপদ

গীতের সাধারণ লক্ষণ হতে পারে না। অবশ্য এরূপ বাক্যপদ উৎকর্ষ-গীত এবং দেশী গীতের সাধারণ ব্যাপার হতে পারে।

অতএব স্বর-সমাবেশের যে রঞ্জকধর্ম প্রকাশ্য ও গোচর সেই হল সমগ্র গীতব্যাপারের পক্ষে সাধারণ এবং প্রধান লক্ষণ। এ কারণে গীতের লক্ষণ বলা হল 'রঞ্জক স্বরসন্দর্ভই গীত'।

মোটের উপর কথা এই গীত, ব্যাপারে রঞ্জক স্বর-সমাবেশ থাকবে, বাগ্‌গেয়কার (বাক্যপদাদি) থাকবে ; এবং যেহেতু সমস্ত সংগীতই তালে প্রতিষ্ঠিত অতএব তালও থাকবে। ভরত যাকে 'গীত' বলেন, শার্ঙ্গদেব তাকেই 'গান' বলেছেন।

এখন চিন্তা হয়—'রঞ্জক-ধর্ম, 'রঞ্জকত্ব', 'রক্তিপ্রদ' প্রভৃতি যে সকল শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে কি ? প্রত্যেক মানুষের অধ্যাত্মের মধ্যে রাগ নামক একটি সংস্কার (instinct) আছে যার বশে কোনও বস্তু বা বিষয়ের প্রতি মানুষের প্রবৃত্তি হয় বা আকর্ষণ হয়। এই রাগ সংস্কারটি উদ্বোধিত হলে মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তু বা বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত হয়। যেমন সুন্দর গোলাপ ফুল দেখলে আমাদের মনে রাগ উদ্বোধিত হয় ; এর ফলে হাতে কাঁটা ফুটে যাবার আশঙ্কা থাকলেও আমরা অনেক সময়ে গোলাপ ফুলটিকে আহরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

কোনও বস্তুবিশেষের সংস্পর্শে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল কতকগুলি অনুভব মাত্রকে সঞ্চয় করে অন্তঃকরণের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। এই অনুভব সমষ্টি যদি অন্তঃকরণের মধ্যে বুদ্ধির আশ্রিত স্বাভাবিক রাগ-সংস্কারকে উজ্জীবিত করে তা হলে সমগ্র অন্তঃকরণের মধ্যে একটি আলোড়ন হতে আরম্ভ করে। এই আলোড়ন-অবস্থাই হল "রঞ্জনা"। দেখা যায় যে, বাইরের বস্তুসকল বিশেষরূপ সম্বন্ধযুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ হলে এবং অনুভবরূপে ভিতরে প্রবেশ করলে তবে বিশিষ্ট রঞ্জনার উদ্ভব হয়। যেমন, সবুজ পাতার আড়ালে লালফুল বিশিষ্টভাবে রঞ্জক। এখানে

সবুজ ও লালের সমাবেশই রঞ্জক। এর প্রকৃষ্ট সাংগীতিক উদাহরণ—আমাদের দেশে বিবাহ ইত্যাদি উৎসবের সংশ্লিষ্ট নহবতের বন্দোবস্ত ও সানাই বাজনা। সানাইয়ের শব্দে উপস্থিত সকলেই রঞ্জিত হয়ে উঠে। যে যেরূপ কাজে ব্যস্ত থাকুক সে সেইরূপ কাজেই আগ্রহান্বিত, উল্লসিত হয়ে উঠে কাজে প্রবৃত্ত থাকে। অধ্যাত্মের মধ্যে রঞ্জনা-প্রবাহ চলতে থাকে; বাইরে সমস্ত কিছুই আনন্দমণ্ডিত, কাম্য, তৃপ্তিকর বলে বোধ হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সানাইয়েরই মাত্র একটি স্বর অন্য স্বরনিরপেক্ষ হয়ে বাজতে থাকলে রঞ্জনা হয় না। দেখা যায় যে, এক জাতীয় অনেক বস্তুর সমাবেশ রঞ্জনাকারক হতে পারে এবং ভিন্ন জাতীয় একাধিক বস্তু—যেমন গীত বাদ্য ও নৃত্ত, এমন একটি মিশ্র-রঞ্জনার সৃষ্টি করে যাকে আলংকারিকদের পরিভাষায় 'সমূহালম্বনাত্মক' রঞ্জনা বলা যায়। আমাদের সাধারণ জাগতিক অভিজ্ঞতায় যাকে 'সুন্দর' বলি সে বস্তুটি বা সেই অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, ঐ উভয় প্রকার রঞ্জনার কোনও একটি বা উভয়েরই সৃষ্টি হচ্ছে বলেই সৌন্দর্য। ভিতরে রঞ্জনা হল না অথচ বাইরে 'জিনিষটী সুন্দর' বললে মিথ্যা কথা বলা হয়, নিদেন পক্ষে চাটুবাণী।

মনে করা যাক্, একটি বিশিষ্ট স্বর-সমাবেশ রঞ্জক হল বা হতে থাকল। যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে ঐ বিশিষ্ট স্বরসংহতি তাদের বিশেষ পারস্পরিক সম্বন্ধকে একভাবে রক্ষা করে প্রকাশিত হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণেও একরূপ বিশিষ্ট রঞ্জনা-প্রবাহ তরঙ্গের মত আবির্ভূত হতে থাকবে; এবং এই রঞ্জনা-প্রবাহ এমন একটি বিশিষ্টরূপ অর্থাৎ অনুভবরূপ গ্রহণ করবে যা অন্য সকল রঞ্জনা থেকে ভিন্নরূপ। রঞ্জনাকারক স্বরসংহতির বাহ্যরূপটি এমন একটি সমূহবাচক বস্তু হল যাকে পরিভাষায় 'রাগ' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাইরে হয় স্বরসংহতিরূপ ঘটনা এবং ভিতরে হয় রাগজনিত আলোড়ন, যাকে রঞ্জনা বলা হয়েছে। কিন্তু এই বাহির ও ভিতরের একটি নিয়ত সম্বন্ধ রয়েছে বলে বাইরের জিনিষটিকেও খাতির করে রাগ

বলা হয়েছে। যেমন আমরা বলি 'একটা কিছু মিষ্টি দাও'; বাইরে মিষ্টত্ব নেই, আছে কেবল বস্তু বা সংঘাত; ভিতরে মিষ্টত্বের উপলব্ধি হয় বলেই বাইরের জিনিষটিকে মিষ্ট বলা হয়। 'রঞ্জনাৎ রাগতা'—রঞ্জনা থেকে রাগ হয়, অর্থাৎ সাংগীতিক রাগ-বস্তু হয়—এই কথাটি সার্থক এইরূপেই হয়।

স্বরগুলি বিশিষ্টরূপে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকলে যদি বিশেষ এক প্রকার রঞ্জনা করে তবে সেই স্বর-সমাবেশ ও প্রকাশরূপ হ'ল 'রাগ'। এই রাগ-বস্তু অর্থাৎ স্বর-সমাবেশের নানারূপ জাতি বা শ্রেণী হয় স্বরগুলির সম্বন্ধভেদে। প্রাথমিক শ্রেণীকরণ করে হয় গ্রাম রাগ, অর্থাৎ ষড়জ গ্রামিক স্বর-সমাবেশ সকল ও মধ্যম গ্রামিক স্বর-সমাবেশ সকল। গান্ধার-গ্রামের লক্ষণ ও ব্যবহার লুপ্ত বা গুপ্ত এজন্য তাকে গ্রহণ করা হয় নি।

গ্রামিক শ্রেণীকরণে গ্রাম কিরূপ ব্যাপার? কোনও স্থায়ী সম্বন্ধ নিয়ে যদি ষড়জ ও পঞ্চম প্রকাশিত হতে থাকে তাহলে এই ষড়জ-পঞ্চম সম্বন্ধকে আশ্রয় করে যত কিছু সমাবেশ হবে সেগুলি ষড়জগ্রামিক। এবং অন্যরূপ কোনও স্থায়ী সম্বন্ধ নিয়ে যদি ঋষভ ও পঞ্চম প্রকাশিত হতে থাকে তা হলে এই ঋষভ-পঞ্চম সম্বন্ধের ভূমিকায় যাবতীয় সমাবেশ হবে মধ্যম-গ্রামিক।

ষড়জগ্রামিক সমাবেশ ও মধ্যমগ্রামিক সমাবেশ এবং উভয়গ্রামিক মিশ্র-সমাবেশ এই তিন লক্ষণে বহুসমাবেশ সম্ভব। এগুলিকে দ্বিতীয় রূপে—'জাতি'তে বিভাগ করা হয়েছে। বিভাগের চিন্তা একই প্রকার, অর্থাৎ অন্য কয়েকটি স্থায়ী সম্বন্ধ দিয়ে এই দ্বিতীয় শ্রেণীকরণ করা সম্ভব হয়। অঙ্কশাস্ত্রীয় আলোচনার দ্বারা দেখা যায় এইরূপ আঠার শ্রেণী বা জাতি হয়; এদের প্রত্যেকটির নাম রূপ বর্ণিত আছে। এই জাতি-বিভাগ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের Genus এবং Species এর মত। জাতিগুলি হল Species।

পরিশেষে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব লক্ষণ রক্ষা করেও সামান্য ইতর-বিশেষ করে রাগ বা রাগ-ব্যক্তি কল্পিত হয়েছে। প্রকাশ্য গান ব্যাপার রাগ-ব্যক্তি দিয়েই নিষ্পন্ন হবে।

গীত ব্যাপারে এইরূপ চিন্তা থেকে 'গ্রামরাগ' 'জাতিরাগ' ও 'রাগ' এই তিনটি যুক্তিযুক্ত চিন্তা সম্ভব হয়েছে। এবং যে পর্যন্ত গ্রাম ও জাতি-রাগের নিয়ম সকল অটুট থাকে সে পর্যন্ত রঞ্জনাও অটুট ও একরূপ থাকে। যেহেতু রাগগুলি জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং জাতিগুলি গ্রামের অন্তর্ভুক্ত, অতএব রাগগুলির মধ্যে আত্মীয়-কুটুম্বিতাসূত্রে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় সম্বন্ধও থাকবে এবং ভিতরেও স্বজাতীয় বা সদৃশ এবং বিজাতীয় বা বিসদৃশ রঞ্জনা করবে। বলা বাহুল্য, অনুশীলন করে দেখা যায় যে, তথাকথিত রাগরাগিণী এই গ্রাম ও জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হয়ে পড়ে।

স্বরসমাবেশের রঞ্জক-ধর্ম বিষয়ে চিন্তার পথে প্রাচীনগণ আর একটি সূক্ষ্ম ও গভীর সিদ্ধান্ত করেছেন। এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু কোলাহল চলছে বলেই প্রাচীন সিদ্ধান্ত জানা প্রয়োজন।

বাইরে যে রাগবস্তু হল তার মূলে গ্রামকে চিন্তা করে প্রাচীনেরা দেখলেন স্বরগুলির যে সম্বন্ধের উপর গ্রামকে স্থাপনা করা হয়েছে সেই সম্বন্ধ শ্রুতি-যোগের অপেক্ষা করে। অতএব রাগের রঞ্জকধর্মের মূলে শ্রুতিযোগেরই ধর্ম। স্বর বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, স্বরের মৌলিক বস্তু কতকগুলি সূক্ষ্ম, মাত্র শ্রবণগোচর বা শ্রবণযোগ্য বস্তু যাকে 'শ্রুতি' বলা হয়েছে। আঘাতের পরেই এদের জন্ম এবং জন্ম হয়েই এরা অতি শীঘ্র অন্তর্ধান করে। প্রাচীন কালের দার্শনিকগণ যাবতীয় 'গতি' ব্যাপারকে যুগপৎ দিকে ও কালে গতি মনে করেছেন; কালে গতিকেই অন্তর্ধান মনে করা হয়। কথিত শ্রুতি আবির্ভূত হবার পর যে অন্তর্ধানের গতি পায় সেটা শ্রুতির কালগত গতি যাকে আমরা 'রেশ' বলি এবং প্রাচীনেরা যাকে 'অনুরণন' বলেছেন।

রণনরূপ ব্যঞ্জনার পশ্চাতে হয় বলে অনুরণন। এই অনুরণন আমাদের কানে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ হলে এমন একটি বিশিষ্ট অনুভবরূপ ধারণ করে যাকে 'স্বর' বলা হয়েছে। শ্রুতিগুলি যেন ঘটনাবিন্দু বা আঘাতবিন্দু, স্বরগুলি যেন ঐ বিন্দুর কালগত বিস্তাররূপ, অনুরণনাত্মক রেখা। স্বর-সমাবেশ তাহলে এই রেখা বা রেশের পারম্পর্য; একটি স্বরের পর আর একটি স্বর বলতে বস্তুত একটি প্রলম্বমান রেশের সঙ্গে ও পরে জড়িত অন্য একটি রেশ মাত্র। এইরূপ চিন্তা করলেই সিদ্ধান্ত হয়, রঞ্জনাকারক রাগবস্তুর মূলে শ্রুতিযোগেরই রঞ্জনা-ধর্ম রয়েছে। শ্রুতিযোগ ত মুহূর্ত অপেক্ষাও অল্পক্ষণ-স্থায়ী; এর পরেও যখন রঞ্জনারও রেশকে পাওয়া যাচ্ছে তখন সেই রঞ্জনার রেশের জন্য একমাত্র স্বরই দায়ী। অতএব স্বর হল অনুরঞ্জক। স্বরের স্বরূপ হল অনুরণন; এর প্রভাবগত লক্ষণ হল অনুরঞ্জকত্ব।

গীতের প্রধান লক্ষণ—'রঞ্জকত্ব' জানা গেল। বিশেষ বিশেষ স্বরসন্দর্ভ রঞ্জক হয়। কিন্তু এই রঞ্জনা যদি কোনও বাক্য বা পদের প্রভাবে মনকে বিশেষভাবে রঞ্জিত করে তবেই হবে মনোরঞ্জনা। রঞ্জনা হল সাধারণ, মনোরঞ্জনা হল বিশেষ অধিকারযুক্ত। উৎকর্ষগীতের অন্তর্গত 'গান' এইরূপ মনোরঞ্জনাকারক হবে; অর্থাৎ স্বর-সমাবেশ সাধারণ রঞ্জনা-প্রবাহের সৃষ্টি করবে এবং পদসমূহ তাদের অন্তর্নিহিত অর্থপ্রতীতিরূপ শক্তি দিয়ে সাধারণ রঞ্জনাকে ভাবের ঘরে আকর্ষণ করবে। স্বর-সমাবেশের সঙ্গে যদি পদাদি না থাকে তাহলে শ্রোতার মনে সাধারণভাবে রঞ্জনা-প্রবাহ হতে থাকবে মাত্র।

প্রাচীনেরা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে গীত বা গানের পদ যে সকল ভাবকে প্রকাশ করে সেই ভাবের অনুযায়ী বা সমঞ্জসভাবে গ্রাম, জাতি বা রাগের সমাবেশকে ঐ গান বা পদের সঙ্গে যোজনা করলে সেই গান সমধিক প্রীতিপ্রদ ও সুন্দর হয়। এইরূপ চিন্তা থেকে অনেক রকম অনুসিদ্ধান্ত করা হয়েছে—গানে কিরূপ স্বর-সমাবেশ হবে অর্থাৎ হওয়া উচিত। উচিত ও

অনুচিত এই চিন্তা আজকের দিনে আমাদের কাছে কিছু ভয়জনক,—বিশেষত সংগীতবিষয়ে। কিন্তু বাস্তবিক এই ঔচিত্য-চিন্তা ভয়াবহ নয়।

প্রাচীন আচার্যগণ সাংগীতিক কোনও কার্যের গুণবর্ণনাচ্ছলে 'উচিত' ও 'ললিত' এই শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। সংগীত ব্যাপারে উচিত বলতে তারা বুঝছেন—যে উদ্দেশ্যে একটি কার্য করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য যা-কিছু করা প্রয়োজন বা অবশ্যকর্তব্য সেই প্রয়োজন বা অবশ্যকর্তব্যকে সম্পাদন করাই হল উচিত, এবং না করা বা অন্যরূপ করা অনুচিত। যেমন করুণ রসের পদে অমুক গ্রাম বা অমুক জাতির স্বরবিন্যাস প্রয়োগ করা উচিত, ইত্যাদি।

অবশ্যই উদ্দেশ্য বলে একটা কিছু থাকলে তবে ঐ উচিত-চিন্তা সম্ভব হয়। যেখানে উদ্দেশ্য বলে কিছু নেই সেখানে উচিত বা অনুচিতের প্রশ্ন উঠে না।

কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে গীতবাদ্যনৃত্তরূপ কৃত্রিম ব্যাপারের একটা উদ্দেশ্য আছে, সুতরাং উচিত-অনুচিত বিচার আছে তখনই বলা যায় যে উচিতকে চিন্তা করতে হবে, প্রতিফলিত করতে হবে ললিতের মধ্যে। সংগীতাচার্য ভরত ও শার্ঙ্গদেব প্রথমে উচিতকে চিন্তা করেছেন, পরে উচিতকে ললিতেরই মধ্যে চিন্তা করেছেন; এই হল উৎকর্ষ-সংগীতের চিন্তার একটি মূল সূত্র। পরে এঁরা চিন্তা করেছেন উচিত ও ললিতবস্তু রুচিকর কিনা। রুচির চিন্তা করেই তাঁরা 'দেশী' বা দেশরুচিগত গীতাদির বিষয় সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন।

এই সমস্ত কথাকে একত্র করে সংক্ষেপে বলতে হলে সার কথা এরূপ হয়—গানের একমাত্র লক্ষণ হল মনোরঞ্জকত্ব, এর অবয়ব রঞ্জক স্বর-সমাবেশ, সুললিত রসগর্ভ পদ এবং তাল। স্বর-সমাবেশগুলি গ্রামরাগ বা জাতিরাগের অন্তর্গত বিধিবদ্ধ রচনা হবে, অথবা রুচিকারক দেশীরাগও হতে পারবে।

আবয়বিক গঠনের পর গুণের চিন্তা। ভরত প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের

সিদ্ধান্তসকলকে সমাহার করে শার্ঙ্গদেব বলছেন—গীত হবে ব্যক্ত, পূর্ণ প্রসন্ন, সুকুমার, অলংকৃত, সম, সুরক্ত, শ্লক্ষ্ণ, বিকৃষ্ট ও মধুর।

ব্যক্ত অর্থাৎ শব্দ (বা ধাতু) ও প্রত্যয়যুক্ত এবং ছন্দ, রাগ, পদ ও স্বর-সকলের দ্বারা অভিব্যক্ত। আভ্যুদয়িক গীত, মার্গ-গীত ও দেশী গীত—এই তিনটিতেই এই গুণ সম্ভব হলেও প্রথম দুটিতেই এর উৎকর্ষ।

পূর্ণ—অর্থাৎ মন্দ্র (আধুনিক উদারা), মধ্য (আধুনিক 'মুদারা') ও তার (আধুনিক 'তারা') স্থানে স্বর সকলের বিশিষ্টরূপ গমকযুক্ত।

'প্রসন্ন'—অর্থাৎ যার অর্থ প্রকট বা সহজেই বোধগম্য।

'সুকুমার'—অর্থাৎ মন্দ্রমধ্যতার স্থানে গতায়াত সময়েও কণ্ঠের সাবলীলত্ব গুণ।

'সম'—বর্ণসকল অর্থাৎ স্থায়ী সঞ্চারী আরোহ ও অবরোহ বর্ণসকল লয়ের সঙ্গে সমঞ্জসীকৃত।

'সুরক্ত'—অর্থাৎ বীণা, বংশী ও কণ্ঠ এই তিনের একতা থেকে উদ্ভূত প্রীতিকারক ধ্বনিরূপ।

'শ্লক্ষ্ণ' অর্থাৎ উচ্চস্থ বা নিম্নস্থ স্বরগুলির প্রকাশে এবং দ্রুত বা মধ্যলয়ের অবস্থাতেও স্বরগুলির প্রকাশের সূক্ষ্মত্ব। বিলম্বিত লয়ে এবং মধ্যস্থানের স্বরের প্রকাশ ব্যাপারে এই সূক্ষ্মত্ব সহজেই হয়, সেজন্য এই অবস্থাগুলি বলার প্রয়োজন হয় না।

'বিকৃষ্ট'—অর্থাৎ তারস্বরে উচ্চারণযুক্ত। অবশ্যই গানের সর্বাবস্থাতেই এরূপ হবে না; যেখানে হওয়া উচিত সেখানে এরূপ হওয়াই গুণ, না হওয়াই দোষ।

'মধুর'—অর্থাৎ প্রধানত লাবণ্যযুক্ত সুতরাং জনমনোহারী। 'লাবণ্য' কথাটি আলংকারিকগণ বা রসশাস্ত্রবিদ্ দার্শনিকগণ প্রায়ই ব্যবহার করেন। সংগীতের মধ্যে নর্তকীর গুণবর্ণনাবসরেও বলা হয়েছে—লাবণ্যকান্তি মাধুর্য ধৈর্যৌদার্য প্রগলভতা ইত্যাদি। লাবণ্য হচ্ছে অবয়বনিরপেক্ষ একটি প্রত্যক্ষ

মনোহারিণী আভা বা ছটা বা গুণ। অবয়বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলের সম্বন্ধের মধ্যে একে পাওয়া যায় না—অর্থাৎ অবয়ব সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েও লাবণ্যবর্জিত হতে পারে। কোন কোনও মুক্তার ভিতর থেকে নয়নানন্দদায়ক অপূর্ব আভা ফুটে উঠে, যার সঙ্গে মুক্তার রূপসৌষ্ঠবের কোনও সম্বন্ধ নেই। একেই বলে লাবণ্য। গান সম্বন্ধেও দেখা যায়, অন্যান্য কিছু দোষ থাকলেও বা গুণের অভাব থাকলেও এক একটি গান এক এক সময়ে বিশেষ রকমে মনোরঞ্জক হয়। সম্ভবত এই গুণ কণ্ঠগত বিশিষ্ট মধুরতা বা লাবণ্য। তবে এটা ঠিক যে গানের অবয়ব-গঠনের মধ্যে এই গুণটি থাকে না।

প্রাচীন আচার্যগণ সব কথা গুছিয়ে বলে গিয়েছেন, আমাদের জন্যে কিছু বাকী রাখেন নি—একথা ভাবলে হয়ত আমাদের মনে দুঃখ হতে পারে। তবে আমরা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে প্রাচীনদের বক্তব্যকে জানিনে বা জানবার চেষ্টা করিনে এবং বহুপূর্বকালের কোনও চিন্তাকে একান্ত আধুনিক, বা 'এটি আমার অভিনব চিন্তা' এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, অন্তত সংগীত বিষয়ে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে। গানের রূপকে প্রসঙ্গ করে কিরূপ চিন্তা করা হয়েছে দেখা যেতে পারে।

নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এই দুই প্রাথমিক শ্রেণী করা হয়েছে। ধাতু দ্বারা ও অঙ্গাঙ্গীভাবে বদ্ধ যে গান-রূপ (form) তাকে নিবদ্ধ গান বলে। এবং বন্ধহীন যে গান-রূপ তাকে অনিবদ্ধ গান বা আলপ্তি বলে। বলাই বাহুল্য এই দুটি রূপের মধ্যেই বাক্যপদ বা বাগ্‌গেয়কার আছে; না হলে ত গানই হবে না।

ধাতু ও অঙ্গ কি ব্যাপার? নিবদ্ধ গানের আরম্ভেই যা গান করা হয়, যেমন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ বা ভূমিকা তাকে উদ্‌গ্রাহ ধাতু বলে। এই উদ্‌গ্রাহ নিষ্পন্ন হলে পরপর মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ নামে অন্য তিনটি বিভাগ অভিব্যক্ত হয়। মেলাপক হল উদ্‌গ্রাহ ও ধ্রুবের মেলকারক মধ্য অবস্থান-বিশেষ। ধ্রুব হ'ল গানের প্রধান ও নিত্য অংশ। বরং উদ্‌গ্রাহ ও মেলাপক নাও থাকতে পারে, কিন্তু ধ্রুব থাকতেই হবে, কারণ গানের প্রকৃত বিষয় ও

ভাব এর মধ্যে ধ্রুবরূপ ও স্থায়িত্বকে পায়। আভোগ নামক পরিশেষ অবস্থার মধ্যে গান পরিপূর্ণতা অর্থাৎ ভাবের শাখাপত্রপল্লব বিস্তার বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন, কখনও বা ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে অন্তরা নামক আরও একটি বিভাগ হতে দেখা যায়।

এই রকমে সর্বশুদ্ধ পাঁচটি বিভাগ পাওয়া যাচ্ছে; এদের মধ্যে ধ্রুব ও আভোগ নিত্য, কারণ প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাবনা যেমন থাকতেই হবে তেমনি তার পরিসমাপ্তি বা সমাহারও অবশ্যম্ভাবী; অর্থাৎ প্রস্তাবনার পরে একটি আকাঙ্ক্ষার রেশ থাকে, এই রেশটুকু আভোগে ক্ষয় করা হয়। অবশ্য আদর্শ গানেরই কথা হচ্ছে। অনাদর্শ গানে যা-তা হতে পারবে; এবং তার প্রভাবও অনাদর্শ অর্থাৎ যা-তা হবে। আধুনিক কালে গানে সাধারণত স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই ভাগ থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চারিটি ভাগ পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট ধ্রুবপদ গানেও ঐ রকম চার ভাগ আছে এবং অতি বিরল ভাবে স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ ও ভোগ নামে পাঁচটি বিভাগকে পাওয়া যায়। আমি এ রকম শুনেছি যে, আকবর বাদশাহের কিছু পূর্বসময়ে রাজা মান নামক কোনও ব্যক্তির সভাপতিত্বে ধ্রুবপদ জাতীয় গানের ধাতু-বিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং উক্ত চারটি বিভাগ কল্পিত হয়েছিল। এই শোনা কথা কতদূর সত্য বলতে পারি না। আর এও শুনেছি যে মিঞা তানসেনের সম্প্রদায়ে পাঁচ বিভাগের পরিকল্পনা হয়েছে। এই পাঁচটি পরিকল্পনার সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, সুতরাং এদের অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু কবে থেকে তা চলে আসছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সম্ভবত রত্নাকরের উদ্ধৃত পাঁচটি বিভাগের সংখ্যা চিন্তাটুকুই আধুনিক কালে প্রবাহিত হয়ে থাকবে। এদের নাম ও রূপ বদলে গিয়েছে; আছে শুধু সংখ্যাবিভাগের কল্পনা।

যে রকমই হোক, আধুনিক কালে আমরা যখন দেখছি যে স্থায়ী অংশে

(যাকে চলিত 'আস্তাই' বলে) গানের প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাবনা হচ্ছে এবং অন্তরা অংশে বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটছে ও তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে তখন আমি মনে করতে বাধ্য যে, যাকে আমরা স্থায়ী বলি রত্নাকর তাকেই ধ্রুব বলেছেন এবং যাকে আমরা অন্তরা বলছি তাকেই আভোগ বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আর একটি চিন্তার কথা আছে। বস্তুর নাম চিরকাল এক রকম থাকে না; কিন্তু যুক্তিযুক্ত অঙ্গ-বিভাগ চিরকাল থাকে। তানসেনের অনেক গানে স্থায়ী ও সঞ্চারীর কথা পাওয়া যায়। কিন্তু কখনও স্থায়ী ও অন্তরা, বা ভোগ বা আভোগ বা ধ্রুব কোনও চিন্তা পাওয়া যায় না। যাই হোক স্থায়ী ও সঞ্চারী যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন আমরা নিঃসংশয়ে মনে করতে পারি যে, স্থায়ী হল প্রাচীনদের ধ্রুব এবং সঞ্চারী হল প্রাচীনদের অন্তরা বা আভোগ বা উভয়ের একত্রাবস্থান।

সাধারণত আধুনিক গানরূপের মধ্যে আমরা উদ্গ্রাহ পাইনে, মেলাপকও পাইনে। কীর্তনগানের গৌরচন্দ্রিকা-পরিকল্পনায় কিন্তু উদ্গ্রাহের বৈশিষ্ট্য এবং সামান্য ভাবে মেলাপকও আছে। আধুনিক ধ্রুবপদ খেয়াল ঠুংরী ইত্যাদি গানে উদ্গ্রাহ ও মেলাপক নেই বললেও সত্যের অপলাপ হবে না।

এই ধাতুগুলি ছাড়াও ছয়টি অঙ্গ চিন্তা করা হয়েছে। তার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করে লাভ নেই, কারণ এগুলি গানের হস্তপদ কল্পনা মাত্র, যেমন বীণাযন্ত্রের দেহ বা নাভি-কল্পনা, উদর-কল্পনা ইত্যাদি। তাদের বক্তব্যের সার হচ্ছে, যে সকল গানে ছয়টি অঙ্গ আছে সেগুলিকে 'মেদিনী', পাঁচটি অঙ্গযুক্ত গানকে আনন্দিনী ইত্যাদি করে দুই অঙ্গযুক্ত গানকে তারাবলী বলা হয়। শার্ঙ্গদেব অন্যের মত উল্লেখ করে বলছেন—শ্রুতি, নীতি, সেনা, কবিতা ও চম্পু এই পাঁচ রকমের গান হয়। চম্পু জাতীয় গানে মাত্র দুটি অঙ্গ থাকে। এই জাতীয় গান এখন উত্তর ভারতে নাই, কিন্তু উড়িষ্যায় আছে।

সালগ, শুড়, রূপক, এলা, রাসক, লম্ভ, কৈবাড়, কন্দ, গজলীল, হয়লীল, ক্রৌঞ্চপদ প্রভৃতি অনেক রকমের নাম ও বিশিষ্ট গানরূপের বর্ণনা আছে।

আজকের দিনে এগুলি অর্থাৎ নামরূপ পাওয়া যায় না, পাবার আশা করাও অন্যায়। ভাগ্যক্রমে হয়ত দু-একটি পাওয়া যাবে। স্রোতের উপর যেমন ছোট বড় নানারকমের ঘূর্ণীকে কিছুকালের জন্য ভাসমান দেখা যায়, গানও তেমনি কিছুদিনের জন্য এক একটি বিচিত্র রূপ আশ্রয় করে কালস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলে। দেশ ও কালগত অসংখ্য ঘটনার চক্রে প্রবাহরূপী গান নিজকে কিছুদিনের জন্য রুচিগত রূপের মধ্যে ধরা দিলেও শেষে বন্ধনরূপটি ভেঙ্গে যায় এবং রূপ আত্মসমর্পণ করে প্রবাহের মধ্যে। প্রবাহ কিন্তু শাশ্বত ও সনাতন, এর বিরাম নেই। এরকম দু-একটি ঘূর্ণ্যমাণ রূপকে দেখা যাক্।

রাগকদম্ব বলে একরূপ গান ছিল; এই গান আবার দু-রকম—নন্দ্যাবর্ত ও স্বস্তিক। যার চারটি বৃত্তিতে চার রকমের তালযোজনা হয় এবং প্রতিপদ বা অর্দ্ধপদ বা প্রতিবৃত্তিকে ভিন্নরূপ রাগ দ্বারা গাওয়া হয় তাকে নন্দ্যাবর্ত বলে। যার মধ্যে উদ্গ্রাহ ও ন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবর্তনা হয় তাকে স্বস্তিক বলে। এই রাগকদম্বই কালের স্রোতে ঘুরতে ঘুরতে আধুনিক কালে সংগীতজ্ঞের ঘাটে এসে তালফেরতা ও রাগমালা নামে সমাপ্তি বা শেষরূপকে পেয়ে অন্তর্ধান করেছে; এদের আর দেখা যায় না।

'চর্চরি' নামে আর একটি রূপ ছিল; ষোল মাত্রার তালে এবং বসন্ত-উৎসবে এর চর্চা হত। আজকেও আমরা হোলি চাঁচর পাচ্ছি, কিন্তু ষোলমাত্রা বিরল, চৌদ্দমাত্রাই প্রচলিত হয়ে পড়েছে। যাই হোক, ইনি এখনও উৎসবের সঙ্গী হয়ে সশরীরে বর্তমান।

ধ্রুব, মঠ, প্রতিমঠ প্রভৃতি রূপভেদ ছিল। এগুলি গানেরই রূপ। এখন এরা গানের পরিভাষার মধ্যে নেই কিন্তু বীণকারের আলাপ-পরিভাষার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে; এদের নাম হল ধুয়া, মাঠা, পরমাঠা। গায়ক এদের রূপ জানেন না, জানেন বাদক তথা বীণকার।

গানপ্রসঙ্গের শেষে গ্রন্থকার একটি অভিনব গানরূপের বিশিষ্ট বর্ণনা করেছেন। বলছেন, এখন আমি গুণান্বিত ও দোষহীন অভিনব উত্তম

'রূপকের' কথা বলি। বিশিষ্টরূপ রচনার সাহায্যে এবং স্থায়ী ও অন্তরায় নূতন নূতন রাগ ও তাললয়ের সাহায্যে একে ব্যক্ত করা হয়। রস বা ভাবের পরিবর্তন অনুসারে এর রাগাংশের পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। এ বিষয়ে ভেদ ও লক্ষণ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সমগ্রভাবে দেখলে এই রূপকই যে আধুনিক ঠুংরীর প্রাচীন রূপ এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ঠুংরির মধ্যে অভিনবরূপত্ব, বহুরাগসমাবেশ, অবস্থাবিশেষে লয় এমন কি তালের পরিবর্তন, রসালংকার প্রবর্তন—এই কয়টি প্রধান কথার সঙ্গে প্রাচীন রূপকের অবয়বের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ওয়াজেদ আলি শাহের সময়ে ঠুংরীর সৃষ্টি হয়েছিল বলে আমাদের যে ধারণা আছে তা হয়ত যথার্থ নয়। সম্ভবত রূপক ক্ষীণজীবী হয়ে পড়েছিল; নবাবের সময়ে এর নব কলেবর লাভ হয়েছে। নাম বদলে যাবে এমন কিছু আশ্চর্য নয়।

এই রূপকের প্রসঙ্গে এক রকম অভিনব গানের কথা মনে পড়ে যার বর্ণনা হরিবংশে পাওয়া যায়। যাদববংশের কোনও উৎসব উপলক্ষে বিদেশ থেকে আগত কয়েকজন গায়ক এই 'অভিনব' ছালুক্য গান করেছিলেন। এর অভিনবত্ব ছিল রাগসমাবেশের বৈচিত্র্যে, অর্থাৎ একই গানে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে ভিন্ন ভিন্ন রাগের ব্যঞ্জনামাধুর্যে। বলা হয়েছে যে, যদুবংশের সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি তথা সাধারণ ব্যক্তি সকলেই এই গান শুনে অতিশয় চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হয়েছিল এবং শেষে যাদব গায়কগণ এই গান শিক্ষাও করেছিলেন—যদিও বহু আয়াসে সেটা সম্ভব হয়েছিল। হরিবংশে উল্লিখিত এই ছালুক্য গানই পরবর্তী রত্নাকরের সময়ে সমৃদ্ধ হয়ে রূপক নাম পেয়েছিল, এরূপ অনুমান করা কষ্টকল্পনা হবে না।

আলপ্তি বা অনিবদ্ধ গানে ধাতু ও অঙ্গ সকলের বন্ধন বা বদ্ধতা থাকে না। কিন্তু বন্ধন বা বদ্ধতা নেই এই মাত্র; এমন নয় যে আদৌ ধাতু নেই বা অঙ্গ নেই। কারণ ধাতু নেই, অঙ্গ নেই, উদ্‌গ্রাহ নেই, মেলাপক নেই, ধ্রুব নেই,

আভোগ নেই, স্বর নেই, পদ নেই তা হলে গান হবে কি দিয়ে? প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নিবদ্ধগানের ধাতু ও অঙ্গসকল পরস্পর সমঞ্জস ভাবে, অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রকটিত; আলপ্তি নামক অনিবদ্ধ গানে ধাতু ও অঙ্গ থাকলেও এদের সংযোজনার নিয়ম নেই, নির্দিষ্টতা নেই। যেন বোধ হয় নিবদ্ধ গান তার রূপকে ত্যাগ করবার সময় যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থাই অনিবদ্ধ অবস্থা। যে বিষয়ে বন্ধন নিয়ম নেই রূপের নির্দিষ্টতা নেই, পূর্ণাঙ্গ সংগীতপক্ষে সে বিষয়ের উপযোগও নেই।

বাদ্য

এখন বাদ্য অর্থাৎ বাদ্য বিষয় ও তার আদর্শ সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

আয়োজনের দিক দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের যতই বিচিত্র সমাবেশ হোক বা বাদক যতই অদ্ভুতকর্মা শিল্পী হোন বাদ্যের উৎকর্ষ রয়েছে "বাদ্যং গীতানুবৃত্তি চ" এই কথার অর্থ ও ইঙ্গিতের মধ্যে; অর্থাৎ বাদ্য গীতকে বা গানকে অনুবর্তন করুক, বাদ্য যেন গীতের প্রতিবাদী বা বিরোধী না হয়। বাদ্যসমুত্থ ধ্বনি সকল যেন গীতের স্বরাংশ বা পদাংশকে অভিভূত বা অতিক্রম না করে, এক কথায় গীতকৃত মনোরঞ্জনাকে বাদ্যধ্বনি যেন বিনষ্ট না করে।

অনুবর্তন কিরূপ? তন্ত্রবাদ্য যথা বীণা ও সুষির বাদ্য যথা বংশী কণ্ঠোদ্ভূত স্বরের অনুকরণ করবে, মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্য যথা পটহ গানের তালকে অর্থাৎ কালপরিমাপগত বিভাগকে স্বকীয় ধ্বনি-বৈচিত্র্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিস্ফুট করবে, ঘনবাদ্য যথা কাঁসি বা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা গানের মাত্রাকে অনুগমন করে গানের ছন্দকে অভিব্যক্ত করবে এবং সমগ্রভাবে গীত ও নৃত্তগত ভাব যেরূপ সৌকুমার্য, দীপ্তি, মাধুর্যগুণের সঙ্গে ফুটে উঠে—বাদ্যধ্বনি গুলির প্রকাশের গুরুতা লঘুতা দিয়ে এবং বিশেষ সমবায় দিয়ে সেই সকল গুণের পোষক হবে। বিশেষ সমবায় অর্থাৎ একাধিক ও ভিন্নরূপ বাদ্যের

বিশেষ কতকগুলি একসঙ্গে বাজালে যে মিশ্রধ্বনি হয় সেই মিশ্রণই সমবায়।

অবশ্যই সংগীত ব্যাপারের মধ্যে গানের ধারা অবিশ্রান্ত থাকে না; প্রত্যেক গানের ভিন্ন ভিন্ন পদ বা ধাতুর মধ্যে কিছু না কিছু বিরাম থাকে এবং পরপর গানগুলির মধ্যবর্তী সময়েও বিরতি হয়। বিরামের সময়ে কি বাদ্য স্তব্ধ থাকবে? আচার্যগণ বলেছেন অবস্থাভেদে বাদ্য-প্রয়োগ চার রকমের হয়—শুষ্কগীতানুগ নৃত্যানুগ, ও গীতনৃত্যানুগ। এরা উত্তোরোত্তর রক্তিপ্রদ। যে সময়ে গীত বা নৃত্তের বিরাম সেই সময়ে যে বাদ্য প্রয়োগ হবে তাকে শুষ্ক মনে করা হয়েছে। গীত বা নৃত্যকে অনুগমন করে না বা কোনও মনোরঞ্জনকারক ব্যাপারের সঙ্গে সংযোজিত নয় বলেই এই একক বাদ্যকে শুষ্ক অর্থাৎ নীরস বলে। তাই বলে একে অবহেলা করা হয়নি; কত রকম শুষ্কবাদ্য হতে পারে, সংগীতপরিকল্পনার কোন অবস্থায় কি রকম শুষ্কবাদ্য হওয়া উচিত সে বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্র ও রত্নাকর উভয় গ্রন্থেই বিশিষ্ট স্বর-সমাবেশ অর্থাৎ গ্রামরাগ, জাতিরাগ বা রাগের সঙ্গে বিশিষ্ট রসের অর্থাৎ শৃঙ্গার হাস্য করুণ ইত্যাদির সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সকল রাগ বাক্যপদনিরপেক্ষ হয়ে নিজস্ব প্রভাবে রসসৃষ্টি করতে পারে এরকম অভিপ্রায় উদ্ধার করা যায় না। তা যদি সম্ভব হত তা হলে 'শুষ্ক' বিশেষণটির সূচনাই থাকত না। অতএব এঁদের চিন্তা-সূত্রটির এরূপ মানে করতে হবে যে গ্রামিক, জাতি বা রাগ-সমাবেশ রসগুলির উদ্বোধক না হয়ে মাত্র আলম্বন বা পোষকস্বরূপ হবে। যখন পোষক মনে করা যাচ্ছে তখন বিরোধী বা হানিকরও মনে করতে হবে। অর্থাৎ কোন্ কোন্ সমাবেশ কোন্ কোন্ রসের ক্ষতিকর সেরূপ জ্ঞানও প্রয়োজন, এর অভাবে শিল্পী হয়ত বিরুদ্ধ সমাবেশকে প্রয়োগ করে সংগীতের রসভঙ্গ করে ফেলতে পারেন। এর একটা উদাহরণ দিই। 'কে হারে জিনে দুজনে সমান, মেতেছে কথায় কথায় নয়নে নয়ন বাণ'—এই গানটি মিলনাত্মক

শৃঙ্গাররসের পদ। পরিকল্পনাকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই পদকে যোগ্য ও অতিসুন্দর স্বর-সমাবেশ দিয়ে সাজিয়েছেন। অন্য একটি গান—'দিবা অবসান হল কি কর বসিয়ে মন'; এটি শান্তরসের পদ, নির্বেদ বা বৈরাগ্য এর স্থায়ী ভাব। এই গানটিও একটি বিশিষ্ট যোগ্যরূপ সুরে (স্বর-সমাবেশ দিয়ে) গাওয়া হয়। এখন মনে করা যাক্, কোনও শিল্পী প্রথম গানটির সঙ্গে দ্বিতীয় গানের সুর যোজনা করে গাইবার চেষ্টা করলেন। ফলে সহৃদয় শ্রোতা বিরক্ত হলেন, সঙ্গীতানভিজ্ঞ শ্রোতা চঞ্চল অন্যমনস্ক হয়ে পার্শ্বগত ব্যক্তির সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন। এরূপ ঘটনা চিরকালই হয় বা হতে পারে; এখনও তাই হচ্ছে, এমন কি উচ্চাঙ্গের সংগীতের নাম নিয়েও। যেমন আধুনিক কালের একটি প্রসিদ্ধ হিন্দী গান মুদরী মোরি কাহে কো ছিন্ লয়ি, যার অর্থ, নায়িকার উক্তি—আমার আংটি কেন ছিনিয়ে নিলে। রসানভিজ্ঞ গায়ক অনেক ক্ষেত্রেই এই পদের ভাবের বা রসের মর্যাদা রাখেন না। ভরসা এই যে অধিকাংশ শ্রোতাই পদের অর্থ বুঝেন না। যাই হোক, প্রাচীন আচার্য-গণ জানতেন যে সাধারণ গায়কের হাতে রসের বিচ্যুতি হবেই। কিন্তু পরিকল্পিত উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে এরূপ হতে দেওয়া উচিত নয় এই ভেবে তাঁরা অনভিজ্ঞ শিল্পীর জন্য একটা মুগ্ধবোধ (foot proof) পদ্ধতি গঠন করে গিয়েছেন শুধু শ্রোতাকে বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। এটা রবীন্দ্রনাথের মত ধ্যানী পরিকল্পনাকারের জন্য নয়, উদয়শঙ্কর বা তিমির-বরণের জন্য নয়। এঁরা স্বীয় প্রতিভা ও অনুভব শক্তি দিয়েই গানের বা সংগীতের সঙ্গে যোগ্য স্বর-সমাবেশ করবার ক্ষমতা রাখেন।

এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে একটি কথা বলা উচিত যার উল্লেখমাত্রই চলে, কিন্তু আলোচনা সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধ আলংকারিক শ্রীঅভিনবগুপ্ত—যিনি ভরত ও শার্ঙ্গদেবের মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বহু উৎকৃষ্ট জ্ঞানপ্রধান রচনা করে গিয়েছেন, তিনি ধ্বন্যালোক নামক রসগ্রন্থের টীকার মধ্যে একাধিকবার বলেছেন যে, বাচ্যার্থনিরপেক্ষ হয়ে মাত্র গ্রাম রাগ

সমাবেশগুলিই রসের সৃষ্টি করতে পারে। শ্রীঅভিনবগুপ্তের মত সহৃদয় জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ কথা একাধিক বার বললে আমরা কখনও সে কথাকে অবহেলা করতে পারি না, এমন কি এরূপ কথা আর কেউ না বললেও এর মূল্য আছে। দুঃখের বিষয়, মাত্র রাগ-সমাবেশ দিয়ে কিরূপে রসোৎপত্তি হতে পারে, সেই রস ও আলংকারিকদিগের কথিত রস বস্তুত একই না অন্য রূপ, তার উদ্বোধকই বা কি এবং আলম্বনই বা কিরূপ এসকল বিষয়ে কোনও আলোচনা পাওয়া যায় না। অতএব একটি অভিনব চিন্তারূপে একে গ্রহণ করেও এর মর্ম বোঝা গেল না। আধুনিক কালেও উচ্চাঙ্গের সংগীতজ্ঞমহলে এরূপ একটা অস্পষ্ট কথা আছে—মাত্র আলাপের অবসরেই রাগ-রাগিণীর রসসৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য কেমন করে হয় এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায় না ; অর্থাৎ যুক্তি-যুক্ত আলোচনা হয় না। একথা মেনে নিলেও স্বীকার করতে হবে এর মূল প্রাচীন কালেই আছে, কারণ শ্রীঅভিনবগুপ্ত শার্ঙ্গদেবেরও পূর্ববর্তী সময়ের ব্যক্তি।

'শুষ্ক' বা নির্গীত বাদ্য কণ্ঠেও হতে পারে, যদি বাগ্‌গেয়কার অর্থাৎ বাক্য-পদাদি না থাকে। এরূপ অবস্থাকে প্রসঙ্গাধীন করে শার্ঙ্গদেব আলাপ ও আলপ্তি চিন্তা করেছেন যার মধ্যে নূতনত্ব আছে। শার্ঙ্গদেব রাগ-রাগিণী চিন্তা গ্রহণ করেন নি ; তার আলাপ নামক ব্যাপারকে পুরুষ ও স্ত্রীভাবে চিন্তা করে বলছেন আলাপন সাধারণ বস্তু ; একে পৌরুষ গুণ দিয়ে সাজালে হবে আলাপ, স্ত্রীসুলভ গুণ দিয়ে সাজালে হবে আলপ্তি। অর্থাৎ যে কোনও সমাবেশকে বিশেষ ভাবে প্রকটিত করলে আলাপ হবে, অন্যরূপ বিশেষ ভাবে সাজালে আলপ্তি হবে এবং এই দুটি বিশেষ রূপ বা লক্ষণাত্মক মূর্তিকে বাদ দিয়ে যা কিছু হবে সে-সব আলাপন।

বলা বাহুল্য, নাট্যশাস্ত্র বৃহদ্দেশী বা সংগীতমকরন্দে এরূপ কোনও চিন্তা পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ চিন্তা শার্ঙ্গদেবের নিজস্ব মনে করব। এর সঙ্গে আদর্শ সংগীত-পরিকল্পনার কোনও সম্বন্ধ নেই। মাত্র এক ব্যক্তিগত

গীতি বা বাদ্য-চেষ্টার (Solo) ফলে এরূপ চিন্তা সম্ভব হয়েছে। শার্ঙ্গদেব এই চিন্তাকে গীতবাদ্য ও নৃত্ত বিষয়ক অধ্যায়ের মধ্যে না রেখে প্রকীর্ণক অধ্যায়ের মধ্যে রেখেছেন। প্রকীর্ণক অর্থাৎ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলির সংগ্রহ। পরে অনিবদ্ধ গানের প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলছেন—আলপ্তি ব্যাপারটি ধাতু অঙ্গ সকল দ্বারা বদ্ধ নয়। এখানে আলপ্তি বলতে সমগ্রভাবে আলাপকে বুঝায়। এর কোনও বন্ধন নেই। এরূপ মুক্তাবস্থা শিল্পীর পক্ষে সুবিধাকর হলেও গীতবাদ্যনৃত্তরূপ ত্রয়ীর পরিকল্পনায় অচল। শিল্পী নেপথ্যে নিজের বাড়ীতে বা বন্ধু-গোষ্ঠীর মধ্যে অনুশীলন করার অবসরে এরূপ মুক্তাবস্থার আশ্রয় নিতে পারেন।

কিন্তু একেবারে মুক্তাবস্থা ত হতে পারে না; যদি হয় সে হবে প্রলাপ। অতএব কোনও না কোনও নিয়ম মানতেই হবে। সেই নিয়মগুলি গানের নিয়ম নয়, স্বরসমাবেশের অন্তর্গত বাদী ও সম্বন্ধী স্বরের নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ। সংক্ষেপে নিয়মটি এইরূপ :—রাগের বাদী বা প্রধান স্বরে রাগ উপবেশন করবে; অতএব এই উপবেশন-প্রাধান্যকে সূচিত করা হয়েছে স্থায় শব্দ দ্বারা। এই শব্দই সম্ভবত আধুনিক 'স্থায়ী'তে পরিণত হয়েছে। এই স্থায় স্বর (স্থায়ী নামক আধুনিক বিভাগ বা musical movement নহে) থেকে ঊর্ধ্বে চতুর্থ স্বর—এই পর্যন্ত গমনাগমন, গমকাদি, অলংকার প্রয়োগ হতে থাকলে 'মুখচাল' বলে। এই কথাটি আজও বীণকারদের মুখে শুনা যায়। এইরূপ করা হলে পুনরায় স্বস্থানে অর্থাৎ স্থায়ী স্বরে আসতে হবে। এই রকমে প্রথম স্বস্থান, দ্বিতীয় স্বস্থান ইত্যাদি কল্পিত হয়েছে। চতুর্থ স্বস্থান হলে রাগালপ্তি পূর্ণ হয়। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝা যায় যে, আধুনিক আলাপকুশল শিল্পী যাকে বিস্তার, (বহলাও বা বাঢ়ৎ) বলেন প্রাচীনেরা বস্তুত তাকেই 'স্বস্থান' মনে করেছেন।

এই রকম আলপ্তিকে দুভাগ করা হয়েছে; একটি রাগস্থাপনা বা রাগালপ্তি, অন্যটি উপস্থাশ্রিত রাগকে তালে প্রতিষ্ঠিত করে আলাপ করা যাকে রূপ-

কালপ্তি বলে। রূপকালপ্তি আবার দুরকম—একটি প্রতিগ্রহণিকা, অন্যটি ভজনী। মাত্র এইটুকু আমরা মনে করব যে আলপ্তি ব্যাপারে রাগাঙ্গ ও তালাঙ্গ উভয়ই কল্পিত হয়েছে। এখনও বীণকার আলাপী ব্যক্তিগণ এই দুই অঙ্গের মর্যাদা রক্ষা করেন। আধুনিক কালের সাধারণ ধারণা এই যে, আলাপে তাল থাকে না।

নৃত্য

এখন নৃত্তের বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সকল চিন্তা সম্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রধান ও মূলগত চিন্তাগুলি দেখা যেতে পারে।

আদর্শ পরিকল্পনায় গীত হবে প্রধান, বাদ্য গীতকে অনুবর্তন করবে এবং নৃত্ত বাদ্যকে অনুগমন করবে এরূপ সর্বপ্রথমেই বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নৃত্ত বাদ্যকে অনুগমন করতে পারে মাত্র ছন্দ ও তাল বিষয়ে; অন্যান্য বিষয়ে গীতকেই অভিব্যক্ত করবে। অতএব চিন্তা হয়, নৃত্ত কিরূপ বিষয় সাহায্যে গীতকে অভিব্যক্ত করতে পারে।

অনাদর্শ এরূপ পরিকল্পনা হতে পারে যেখানে মাত্র নৃত্ত ও বাদ্য মিলিত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাদ্য নৃত্তকে অনুবর্তন করবে একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানেও ভাবতে হয় নৃত্তের ব্যাপারীভূত বিষয় কিরূপ।

আরও একটি প্রাসঙ্গিক চিন্তা আছে। রত্নাকরে নর্তনাধ্যায়ের আরম্ভেই নৃত্তের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এরূপ কথা পাওয়া যায় যে যদিও সামবেদের উপবেদ স্বরূপ গান্ধর্ববেদ চিন্তিত হয়েছে এবং এই গান্ধর্ববেদ সংগীতকে সমগ্ররূপে অধিকার করে তবুও সংগীতের মধ্যে নৃত্তের প্রাধান্য সম্ভব এবং একারণে নাট্যবেদও চিন্তিত হয়েছে। অবশ্য একে নৃত্যবেদ, বা নৃত্যবেদ না বলে নাট্যবেদ কেন বলা হল তার কারণ অন্যরূপ। যাই হোক্, নৃত্ত প্রধান, পূর্ণাঙ্গ, আদর্শ সংগীতও হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই গীত ও বাদ্য নৃত্তকে অনুসরণ করবে। এখানেও চিন্তা হবে, নৃত্তের বিষয় কি হতে পারে

যার দ্বারা তার স্বকীয় পরিকল্পনা সম্ভব। এই সকল চিন্তাকে অনুসরণ করলেই আমরা মূল বিষয়গুলি পাই।

নৃত্ত ও নৃত্য শব্দ দুটির মূলধাতু 'নৃতি'; এর মানে গাত্র বিক্ষেপ করা, সরল ভাষায় গা হাত পা নাড়া। কত রকমের যে গাত্র বিক্ষেপ হয় তার সংখ্যা নেই। কত কি প্রয়োজনে মানুষ অঙ্গ-সঞ্চালন করে, সেই প্রয়োজন-গুলি কিন্তু গণনার মধ্যে আসে একটু চিন্তা করলে।

প্রথমত, এমন গাত্রবিক্ষেপ হতে পারে যা কোনও বিশেষ মনোভাবকে প্রকাশ করে না, বা অন্য কোনও ব্যক্তির অনুকরণ করে না; যেন কায়মনো-বাক্যের একটি স্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চালন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই এর প্রবর্তন, যেমন শিশুদের স্বাভাবিক অঙ্গ বিক্ষেপ বা পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির ব্যায়াম কার্য। বেশ বুঝা যায়, সংগীতের অতিরিক্ত অন্য কোনও প্রয়োজন সাধিত হচ্ছে। এমন যদি হয় যে, ছন্দোবদ্ধ হয়ে ও কোনও সুদৃশ্য পারম্পর্য অবলম্বন করে এই অঙ্গবিক্ষেপ বা ব্যায়ামই নিষ্পন্ন হল; এরূপ হলেই অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত, সুদৃশ্য অঙ্গ-চেষ্টা হতে থাকলেই তাকে 'নৃত্ত' বলা যাবে। সংগীতে এর অধিকার এসে পড়েছে দুই কারণে প্রথমত, এ নিজেই সুদৃশ্য সুন্দর; দ্বিতীয়ত, গাত্রবিক্ষেপ হিসাবে একটা মূল ব্যাপার যা না হলে নৃত্ত হবে না, এবং যা দিয়ে সংগীতের বিভিন্ন পরিকল্পনা গঠিত হতে পারবে। ফলিতভাবে এরূপ নৃত্তের সুন্দরতা ও চমৎকৃতির কারকস্বরূপ কতকগুলি রূপ ও গতি আছে যাদের বিশেষ বিশেষ সমাবেশ ও পারম্পর্য মানুষকে সহজেই শীঘ্র 'রঞ্জিত' করে। এই নৃত্তই হল সমগ্র নৃত্যের ভূমিকা স্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ বিশেষ অঙ্গবিক্ষেপ দিয়ে আমরা মনোভাবকে বুঝাবার চেষ্টা করি। এরও সংখ্যা অগণিত। কিন্তু মনোভাবগুলির মধ্যে যেগুলি স্থায়ী, চমৎকার বা সুন্দর সেগুলি গণনার মধ্যে এসে পড়ে। এ সকল ভাবের কথা এখানে আলোচনার অবসর নেই। এগুলিকে বেছে নিয়ে

সংগীতের উদ্দেশ্যের উপযোগী করে প্রকাশমান বিশিষ্ট অঙ্গ-চেষ্টা দ্বারা যে পরিকল্পনা তাকে নৃত্য বা ভাব-নৃত্ত বলে। আধুনিক প্রচলিত হিন্দী ভাষায় একে 'ভাব' বা 'ভাও' বলে। সকলের চেয়ে মনোরম যে হিন্দী গান যাকে ঠুংরী বলা হয়, তার সঙ্গে এই ভাবনৃত্তের বিশেষ সম্বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মনোরম বলি এ জন্য যে মাত্র ঠুংরীতেই গীত বাদ্য ও নৃত্তের সমন্বয় হতে দেখা যায়। অন্য গান, যথা ধ্রুবপদ খেয়াল বা টপ্পায় এই সমন্বয় নাই; অবশ্য অঙ্গবিক্ষেপ দেখা যায়, কিন্তু সুন্দরতা ও ভাবব্যঞ্জনার অভাবে তাকে নৃত্ত বা নৃত্য বলা উচিত হবে না।

তৃতীয়ত, কোনও বিশেষ ভাবকে স্ফুটিত না করেও কোনও ব্যক্তি-বিশেষের (বর্তমান বা অতীত কালের) অনুকরণ করতে গিয়ে অঙ্গচেষ্টার প্রয়োজন হয়। কতরকম মানুষ হয়েছে ও হচ্ছে তার সংখ্যা হয় না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পৌরাণিক চরিত্র—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রাম, রাবণ, অথবা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি যেমন শিবাজী, ঔরঙ্গজেব, রাণা প্রতাপ প্রভৃতির জীবনের ঘটনাকে অবলম্বন করে কোনও প্রদর্শনযোগ্য সুন্দর পরিকল্পনা করলে ঐ সকল ব্যক্তির অনুকরণ যাতে সার্থক হয়, সূচক হয় এরূপ শারীর-সজ্জা (make-up) এবং অঙ্গ-চেষ্টা করতে হবে এতে সন্দেহ নেই। এই শেষোক্ত সূচক, অনুকরণাত্মক অঙ্গ-চেষ্টা হল 'নাট্য' বা অভিনেয় নৃত্ত। নর্তনের উপাদানের অধিকারে আহার্য নামক বিভাগের মধ্যে শারীর-সজ্জাকে রাখা হয়েছে।

এই তিনটি ছাড়া সংগীতের উপযোগী নৃত্তের আর কোনও স্বকীয় পরিকল্পনা সম্ভব নয়। প্রাচীনেরা শ্রেণীকরণ চিন্তায় কি সুন্দর ভাবেই না স্বভাব বা স্বাভাবিক কার্যকে মূলরূপে চিন্তা করে পরে প্রয়োজনসিদ্ধির দিক দিয়ে তারই উৎকর্ষাবস্থার চিন্তা ও ক্রমসকল নির্ধারণ করে গিয়েছেন! নৃত্ত হল সকলের সাধারণ ও সকলের চেয়ে জৈব। এর সামান্য বা সাধারণ প্রয়োজন-সিদ্ধি জৈব বা স্বাভাবিক প্রচেষ্টাগত হলেও একে বর্জন করা যাবে না। যাকে

বর্জন করা যায় না তাকে যতখানি সম্ভব সুন্দর ও সমঞ্জস করাই ত উন্নততর অভিব্যক্তি।

মূলে যদি নৃত্তই হয় তবে ত্রয়ী সম্পর্কে নৃত্ত না বলে নৃত্য বলা হয় কেন? এবং শাস্ত্রের নাম নৃত্ত-বেদ অথবা নৃত্য-বেদ না হয়ে নাট্যবেদই বা বলা হয়েছে কেন?

কণ্ঠোদ্ভূত সব কিছুই যেমন সংগীতোপযোগী গীত নয়, লৌহ চর্ম কাষ্ঠ বংশোত্থিত সব কিছু শব্দই যেমন সংগীতোপযোগী বাদ্য নয়, সেরূপ পশু পক্ষী মানুষের সব কিছু গাত্র-বিক্ষেপ নৃত্ত হলেই নৃত্য নয়। যেরূপ হলে গাত্র-বিক্ষেপ দিয়ে চমৎকার সুন্দর বিশিষ্ট রূপ, স্থায়ী ও সঞ্চরণশীল মনোভাব প্রকাশ করা যায় সেইরূপ চেষ্টাই আদর্শ। একে আহরণ করতে হবে, নির্বাচন করতে হবে, প্রয়োগযোজ্য করতে হবে, পরিশেষে প্রয়োগ করতে হবে। এই 'করতে হবে'র খাতিরে 'নৃত্য' শব্দ ও নৃত্য-চিন্তা হয়েছে। যেমন, অনেক কিছুই গলাধঃকরণ করা যায়, কিন্তু সেগুলি সবই খাদ্য নয়। খাদ্য বলতে বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, বিশেষভাবে আহরিত, নির্বাচিত ও পরিশোধিত বস্তুকেই বুঝায়। নৃতি ধাতুর এই ব্যাকরণসিদ্ধ রূপান্তরটি স্পষ্টভাবেই উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে ইঙ্গিত করে। প্রাচীন আচার্যগণের ব্যাকরণপ্রিয়তার মূলে সূক্ষ্ম ও সুনিবদ্ধ চিন্তাপ্রিয়তাকেই পাওয়া যায়, যদিও আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ব্যাকরণের কাঁটাতার অতিক্রম করে চিন্তাকে অনুসরণ করা কষ্টকর। অতএব সংগীতের উপযোগিতার দিক দিয়েই নৃত্য চিন্তা করা উচিত।

নাট্যই হোক, নৃত্যই হোক আর নৃত্তই হোক ছাত্র শিখবেন গুরুর নিকট গুরুকে বা তাঁর ইঙ্গিতকে অনুকরণ করে। অতএব শিক্ষা-অঙ্গে ব্যাপারটি হচ্ছে অনুকরণাত্মক। এই অর্থে শিক্ষাকে বা শিক্ষাকার্যকে যে শাসনমূলক চিন্তার অধিকারভুক্ত করা যায় তাকে নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যবেদ বলাই সঙ্গত। শাস্ত্র শিল্পীর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও শাসিত করে নেপথ্যে; আচার্য-কল্প উপাধ্যায়শ্রেণীর চেষ্টা ও কার্য হল নেপথ্যে; শাস্ত্র নেপথ্যচেষ্টিত দিক-

দর্শনী। কখনও শিল্পীর সাক্ষাৎ প্রয়োগকে বা প্রদর্শন-চেষ্টাকে রঙ্গমঞ্চে বা সভায় শাসন করে না। অতএব নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যবেদ কথাগুলি সঙ্গত। কিন্তু যদি শিক্ষাকেই প্রধান মনে না করে উপদেশবর্জিত, শুদ্ধ জ্ঞানমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয় তা হলে অবশ্যই 'নৃত্তনির্ণয়' বা 'নৃত্যচিন্তামণি' বা ঐরূপ নাম হতে পারে।

আমাদের মনে এরূপ প্রশ্ন জাগে—নৃত্তশিল্পী কি মাত্র অনুকরণকেই, অভিনয়কেই অবলম্বন করে নাট্য নৃত্য ও নৃত্তকে অভিব্যক্ত করেন? তাঁর মনের মধ্যে কি ভাব সকলের উদয় হয় না? সমস্ত কিছুই কি অভিনয়?

এর উত্তরে প্রাচীন আচার্যগণ বলছেন—নৃত্তশিল্পী হলেন রসভাবের আধার মাত্র; তাঁর নিজের মনের মধ্যে ভাবও হবে না, রসও প্রত্যক্ষ হবে না। যদিই বা হয় তা হলে নৃত্ত, নৃত্য বা নাট্য-কার্যই স্তম্ভিত হয়ে যাবে, পণ্ড হয়ে যাবে; অন্তত এদের সুচারুত্বে হানি হবে। অন্য পক্ষে নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্যের দর্শক সামাজিক ব্যক্তি শিল্পীর অভিব্যঞ্জনা থেকে ভাবগুলি আহরণ করে নিজের সম্বিতে রস নামক রূপান্তরিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ও আস্বাদন করে। যেমন, পানীয় বস্তু কোনও পাত্রে বা আধারে রেখে পরিবেশন করা হয়; সামাজিক ব্যক্তি ঐ পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু পাত্র বা আধার পানীয়কে ভোগ করে না, সেরূপ নর্তন ব্যাপারে ভাব সকলের আধার হল নৃত্তশিল্পী, তাঁকে পাত্র বলা হয়। তিনি মাত্র বস্তুর পরিবেশক, নিজে রসাস্বাদ করেন না। প্রাচীনদের এরূপ অভিপ্রায়। এখন আধুনিক বিশেষজ্ঞদের কথা শুনা যাক্। আধুনিক কালের নট-চূড়ামণি শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে, অভিনেতা কখনই নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন না; যথা চাণক্যের ভূমিকায় অভিনেতা চাণক্যের অভিনয় করবেন মাত্র। তিনি যদি চাণক্যের অভিনেয় ভাবতরঙ্গের মধ্যে নিজেকেই ভাসিয়ে দেন তাহলে ভূমিকা একেবারেই ভূমিসাৎ হয়। যা কিছু হবে বা

হওয়া উচিত সমস্তই অভিনয়! দেখা যাচ্ছে এই মতবাদে প্রাচীনদের চিন্তাসূত্রটি অক্ষুণ্ণ আছে।

নর্তনের মূলগত কার্য নৃত্ত হল জৈব-প্রচেষ্টা; একে কি রকমে সংস্কৃত ও পরিশোধিত করে সংগীতোপযোগী করা হয়েছে দেখা যাক্।

এই স্বরূপত জৈব-কর্মের মূলানুসন্ধান করে প্রাচীনেরা বলেছেন, এই কর্মের মূলে অঙ্গসঞ্চালন প্রবৃত্তি রয়েছে। শরীর মন ও বাক্যের মধ্যে এই প্রবৃত্তির স্ফুরণ হলে তবে প্রকাশ্য অঙ্গ-বিক্ষেপ হয়। অতএব কায়মনোবাক্যের অন্তস্তলে প্রবৃত্তিরও মূল রূপে 'বৃত্তি' বা যতনচেষ্টা ইতিপূর্বেই স্বাভাবিকরূপে (instinct) আছে স্বীকার করতে হবে। স্বভাবে যখন বৃত্তি রয়েছে এবং মাত্র তারই সাহায্য নিয়ে যখন নৃত্ত-প্রচেষ্টা হচ্ছে তখন এই বৃত্তিগুলিকে একটু সাজিয়ে নিতে হয়, সংযত করতে হয় এবং শিক্ষা ও অভ্যাস ব্যাপারটি এখান থেকেই আরম্ভ করতে হয়।

এই বৃত্তিগুলি, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যের চেষ্টাগুলি স্বভাবত মানুষের চলা-ফেরা, শোওয়া-বসা, কথা-বলার ভঙ্গি ও রূপসকলের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এই আত্মপ্রকাশভঙ্গি ব্যক্তিগত হতে পারে যা থেকে ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়; আবার এর একটি সাধারণ রূপ সমাজ বা দেশগত হয়ে সমাজ বা দেশগত ব্যক্তিসাধারণের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। যেমন, আফগানিস্তানের পার্বত্য অধিবাসীদের চলা-ফেরা কথা বলার ভঙ্গি সমস্ত মিলিত হয়ে এমন একটি বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় যা আমাদের দৃষ্টিতে কিছু রুক্ষ উদ্ধত বা আকস্মিকতাযুক্ত বলে মনে হয়। এদের মধ্যে যে বিশ্রম্ভালাপ নেই বা অসম্ভব এমন নয়, কিন্তু ঐ বিশ্রম্ভালাপের রূপটিও কিছু উদ্ধত ও আকস্মিকতা-গ্রস্ত। আবার মণিপুরের অধিবাসীদের স্বাভাবিক কার্য সকল, যেমন চলা-ফেরা ইত্যাদি দেখলে বোধ হয় এরা সুকুমার কোমল ও বিনীত। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যেও কলহ হয় এবং কলহের মধ্যেও ঐ বৃত্তিবৈশিষ্ট্যই পাওয়া যাবে।

এই স্বাভাবিক আন্তরিক বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করে, তা থেকে নির্বাচন

করে, কিছু শোধিত করে এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলিকে একত্র সমাবেশ করে চার রকমের পরিশোধিত বৃত্তিকে উৎকর্ষণ করা হয়েছে, সংগীতের উপযোগী করা হয়েছে। যেমন, স্বাভাবিক শব্দগুলিকেই পরিশোধিত করে, উৎকর্ষণ করে সংগীতোপযোগী স্বর গ্রহণ করা হয়েছে ; স্বভাবজ কাষ্ঠ বংশ চর্ম ধাতু প্রভৃতির বিশেষকে গ্রহণ করে, সমাবেশ করে, সংযোজনা করে বাদ্য নির্মিত হয়েছে এবং এদের ধ্বনি সংগীতোপযোগী করা হয়েছে। গীত-বস্তুর ও বাদ্য-বস্তুর নির্মাণকল্পে যখন পরীক্ষা করে নির্বাচন করা ইত্যাদি প্রয়োজন তখন নৃত্তের মূলগত স্বাভাবিক বৃত্তি সকলকেও পরীক্ষা ও নির্বাচন করে গ্রহণ করাই ত উচিত?

বৃত্তিগুলিকে পরীক্ষা ও নির্বাচন করে তাদের বিশেষ বিশেষ কতকগুলির সমাবেশ করে সমাবেশ-রূপগুলিকেই পারিভাষিক বৃত্তি নাম দেওয়া হয়েছে। শুধু সংগীতের উপযোগী বলে নয়, এমন কি কাব্য সম্বন্ধেও অর্থাৎ রচনার অন্তরালবর্তী মনোভাব বা চেষ্টাকেও প্রাচীনেরা বৃত্তির অধিকারভুক্ত করে নিয়েছেন ; বলেছেন—

কাব্যং গীতং তথা নৃত্তং বৃত্তিহীনং ন শোভতে।
অতোবৃত্তির্বিজানীয়াদেতা ভরতভাষিতাঃ ॥

অর্থাৎ কাব্য গীত ও নৃত্ত বৃত্তিহীন হলে শোভা পায় না ; অতএব ভরত-ভাষিত এই বৃত্তিগুলি বিশেষভাবে জানা কর্তব্য।

সমস্ত কার্যের মূলেই ত স্বাভাবিক বৃত্তি রয়েছে ; তা হলে বৃত্তিহীন কাব্য, সংগীত বা নৃত্য বলা হয় কি করে ? তাৎপর্য এই যে, বৃত্তি স্বাভাবিক বা সাধারণ হলেও তাদের মার্জিত করে, বিশেষ সমাবেশ কল্পনা করে ভরত চার রকম উৎকৃষ্ট 'বৃত্তি'কে কাব্য, গীত ও নৃত্ত পক্ষে উপযোগী করে গিয়েছেন। এই চার রকমের বৃত্তিকে বাদ দিয়ে কাব্য রচনা, গীত বা নৃত্ত কার্য করলে ব্যাপারটি শোভাহীন হয়।

কতকগুলি মনোভাব, কিছু বাক্‌চেষ্টা, কিছু সজ্জা, ও কিছু শারীরচেষ্টা—

এদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করে এক একটি সমাবেশ করা হয়েছে। যেমন; বাক্য ও অঙ্গাভরণের সুকুমারতা, গীতনৃত্ত বিষয়ে উল্লাস ও শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য, এই তিনের সমাবেশ কৈশিকী বৃত্তি। সৌন্দর্য ও সুকুমারতার সাহায্যে এই বৃত্তি রৌদ্র ও অন্যান্য রসকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। সৌন্দর্যই হল এর প্রাণস্বরূপ। সাত্বতী বৃত্তিতে হর্ষ, শৌর্য ত্যাগ প্রভৃতি বীর-রসোচিত ভাব ও যত্নের প্রকাশ হবে, রৌদ্র ও অদ্ভুত ও ভয়ানক রসও হতে পারবে। সাধারণত মনোভাব সকল সাত্বিক প্রযত্নে প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে ঔদ্ধত্য আছে বলে শৃঙ্গার, শান্ত ও করুণ রসে প্রয়োগ হওয়া উচিত নয়। আরভটি নামক বৃত্তিতে রৌদ্র ও অদ্ভুত রস বিষয়ে প্রবণতা থাকে, নানারূপ যুদ্ধকৌশল বাহ্বাস্ফোট, দর্পযুক্ত বাক্য ও শারীরচেষ্টা, আস্ফালন, ঐন্দ্রজালিক কার্যের চেষ্টা প্রভৃতি থাকবে। ভারতী বৃত্তিতে বাক্য বা বাক্‌চেষ্টার প্রাধান্য, সংস্কৃত ও শোধিত শব্দের প্রয়োগচেষ্টা এবং পৌরুষ থাকবে।

এই চিন্তাকে অনুসরণ করে কাব্যের, গীতের ও বিশেষ ভাবে নৃত্তের কারুকার্যের মধ্যে বৃত্তিগুলিকে পাওয়া যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত ঋতুরঙ্গ নামে পূর্ণাঙ্গ-সংগীতের মধ্যে এবং অধিকাংশ রচনার মধ্যেই কৈশিকী-বৃত্তির পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গি পাই। শ্রীউদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণ পরিকল্পিত 'গজাসুর বধ' নামে পূর্ণাঙ্গ সংগীতের মধ্যে কৈশিকী ও আরভটির অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করেছি। প্রাচীনগণ অর্থাৎ ভরত ও শার্ঙ্গদেব সংগীতে কৈশিকী-বৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে গিয়েছেন এরূপ প্রমাণ তাদের লেখার মধ্যেই পাই। যদিও চারটি বৃত্তিরই বিশেষ বিশেষ উপযোগিতা আছে এরূপ বলা হয়েছে। এদের উপযোগ কি রকম দেখা যাক্।

মনোভাবসমূহের প্রকাশভঙ্গির অনুকরণ করে অভ্যাস করে তবে উপযোগ হয়। শিল্পীর নিজের ব্যক্তিগত, সমাজগত, এবং দেশগত বৃত্তি বা 'কায়মনোবাক্যজা' চেষ্টা ইতিপূর্বেই স্বভাবগত হয়ে আছে। শিল্পী

অভ্যাসপূর্বক এগুলিকে অতিক্রম করবেন এবং সংগীতের বিষয়গত বৃত্তি আশ্রয় করে যথাযোগ্য প্রকাশভঙ্গী দিয়ে বিষয়কে পরিস্ফুট করবেন এরূপ আদর্শ কল্পিত হয়েছে। অতএব প্রদর্শনীর পূর্বেই এই সংযমন বা অতিক্রমণকে অভ্যাস করতে হবে। এরূপ অভ্যস্ত হলে কার্যক্ষেত্রে অযাচিত বিরুদ্ধভঙ্গি বা অশোভনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। নিজের ব্যক্তিগত বৃত্তিকে অতিক্রম করতে অক্ষম হলে বা আংশিকভাবে সক্ষম হলে অবশিষ্ট এমন কিছু তার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে থেকে যায় যাকে ব্যক্তিগত বা দেশগত ঢং (mannerism) বলা চলে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, বিশেষ বিশেষ নাট্যকুশল ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় কৃতকার্য হলেও হয়ত অন্যরূপ ভূমিকায় তাঁদের কার্য স্বাদহীন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এর কারণ শিল্পী তাঁর স্বাভাবিক বৃত্তিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেন নি। গান বিষয়ে দেখা যায়, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের ব্যক্তিদের যে একটি সাধারণ, উদ্ধত, ক্ষণপ্রস্তুত (alert) মনোভাব আকার ইঙ্গিত ও কার্যে প্রকাশ পায়, ঐ সকল দেশের গায়কেরা অধিকাংশত সেই স্বাভাবিক বৃত্তি-সমাবেশকে উল্লঙ্ঘন করতে পারেন না। ফলে উৎসাহ, হর্ষ, শৌর্য প্রভৃতি ভাবসূচক বীররসাত্মক গানগুলি এদের মুখে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেলেও শৃঙ্গার বা করুণরসাত্মক পদগুলির অপমৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও পদাবলীসমূহের প্রভাব সাধারণ ব্যক্তির বৃত্তিকে এরূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, গায়কের কৈশিকী বৃত্তি অবলম্বন করাই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ফলে আরভটিবৃত্তি বিষয়ের অবতারণা হলেও এর প্রকাশভঙ্গি যথোচিত স্পষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি আদ্যোপান্ত কৈশিকীতে নিয়োজিত। নৃত্ত বিষয়ে দেখা যায়, রাজপুতানা পঞ্জাব, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের যোধপুরী ঢঙয়ের নৃত্ত মূলে আরভটিকে আশ্রয় করে আছে। নর্তক বা নর্তকীকে কৈশিকী বৃত্তিতে নিয়োজিত করলেও স্বাভাবিক আরভটি-পক্ষপাতিত্ব দৃশ্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

অতএব উপযোগিতাকে আমরা এরূপে বুঝতে পারি যে, সংগীত সংঘটনার মধ্যে যে সকল বিচিত্রভাবের অভিব্যক্তি কাম্য হয় সেগুলিকে সূচিত ও পুষ্ট করতে হলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য গায়ক বাদক ও নর্তক একজাতীয় মনোভাবগ্রস্ত হয়ে একটি বিশেষ বৃত্তিকে আশ্রয় করবেন। যেখানে বিষয়টি সুকুমার, শৃঙ্গাররসাত্মক সেস্থলে অত্যন্ত তারস্বরে চিৎকার, সমসাময়িক জয়ঘণ্টা দুন্দুভি বা তিত্তিরী বাদন করলে বড়ই অশোভন হয়; এবং যেখানে বিষয়টি ত্রিপুরদাহ বা গজাসুর বধ বা ঐরূপ কিছু সেখানে বীণা ও মুরলীর ধ্বনি মাত্র অবলম্বন করে করুণ আর্তনাদের সহযোগ করলে অতি সাধারণ ব্যক্তিও যথার্থ সমালোচক হয়ে পড়ে। অতএব সমগ্র বিষয়ের মধ্যে যে ঘটনা বা যেরূপ ঘটনা সাধারণ ভূমিকারূপে থাকে, সেই সাধারণ ভূমিকাকে অবলম্বন করেই বৃত্তি বিনিয়োগ হবে। বিশেষ বিশেষ স্থলে এই সাধারণ অবলম্বন থেকে কিছু প্রস্থান (departure) ঘটবে, তাতে ক্ষতি নেই।

এরূপ অনুমান হয়, সংগীতপরিকল্পনার কার্যে প্রাচীনগণ 'আন্দাজের' উপর নির্ভর করতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং সংগীতরূপ সংঘটনার নির্মাণ-কার্যটি যাতে সুচারু হয় সেজন্য কতকগুলি যুক্তিযুক্ত নিয়মও নিয়ন্ত্রণ করে গিয়েছেন। একটি বৃহৎ অথচ আদ্যোপান্ত সুন্দর অনুষ্ঠানকে আন্দাজের উপর ছেড়ে দেওয়া সমীচীন কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন হওয়াই উচিত নয়।

নৃত্যবিষয়ে প্রাচীনেরা অন্য বহুপ্রকার চিন্তা ও সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন যার মধ্যে প্রবেশ করার অবকাশ নেই। আপাতত একটি সাধারণ চিন্তাকে অনুসরণ করা যাক্।

তাল

গীত বাদ্য নৃত্য তিনটি পৃথক ব্যাপার ; একটি কণ্ঠের, অন্যটি নির্জীব বস্তুসাপেক্ষ, তৃতীয়টি সমগ্র অবয়বের সঞ্চালন ব্যাপার। এই তিনটি পৃথক ব্যাপার একত্র করে একটি সমূহালম্বনাত্মক রঞ্জনা হয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এদের মধ্যে একটি সাধারণ বস্তু বা যোগসূত্র না থাকলে এদের যোগাযোগ সম্ভবই হতে পারে না। সুতরাং একটি সাধারণ বস্তু বা ভূমিকা স্বীকার করতে হয়। এই সাধারণ বস্তু হল ছন্দ। এর মূলে আছে স্পন্দন-ধর্ম; এর প্রকাশরূপ হল কালগত পরিমাপক বিভাগ বা তাল এবং এর প্রভাব হল সম্বিতের মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি করা।

এর প্রকাশরূপ তাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে গীত বাদ্য ও নৃত্য তিনই তালে প্রতিষ্ঠিত। গীত বাদ্য ও নৃত্য বন্ধন করা হয় ; এই বন্ধনীকে ছন্দ মনে করা হয়। ছন্দের মূলে আছে স্পন্দনধর্ম বা উল্লাসনধর্ম। নাদ বা 'ধ্বনি' নামক সূক্ষ্ম অব্যক্ত, সাধারণ বস্তুতেই এই ধর্ম আছে। ভরত একটি সূক্ষ্ম চিন্তা করে বলছেন, যেখানে শব্দ আছে সেখানেই ছন্দ আছে ; এদের পৃথক চিন্তা সম্ভব নয়।

গীত বাদ্য ও নৃত্যের ঘটনাগুলি এমন একটি অভিব্যক্তি লাভ করে যার মধ্যে শ্রবণগত শব্দ-সমাবেশ এবং দর্শনগত গতি-রূপ এ দুয়ের সংযোজনা মাত্রই মূলত দেখা যায়। বিচিত্র শব্দ-সমাবেশ ও গতি-রূপগুলি কালগত পরিমাপের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পর পর পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হতে থেকে আমাদের অনুভবের রাজত্বে অর্থাৎ সম্বিতের মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন ও রঞ্জনা এক ব্যাপার নয় ; বরং একথা বলা যায় যে, রঞ্জনা-প্রবাহই আন্দোলনের বিশিষ্ট রূপ পায়। আন্দোলন ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ ও সহজ। সহজ বলি এজন্য যে, নিতান্ত শিশু, অপরিণতবয়স্ক বা সংগীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন এই আন্দোলন অনুভব করতে অধিকারী ও সক্ষম

তখন মনে করতে হবে এই আন্দোলন বিষয়ে একটি সংস্কার বা উন্মুখতা জীবেরই সহজাত ধর্ম। এই ধর্মটি সম্বিতের মধ্যেই আছে আনন্দরূপে। বাইরে থেকে আগত আন্দোলনের সঙ্গে এই আনন্দের সমধর্মিত্ব আছে; সেইজন্যই একটি থেকে অন্যটির পরিণতি হয়, আনন্দ থেকে আন্দোলন হয়, আন্দোলন থেকে আনন্দ হয়। 'আনন্দে নেচে উঠল' 'আহ্লাদে নেচে উঠল' প্রভৃতি প্রচলিত কথার মধ্যে এই সত্যটি নিহিত রয়েছে।

উক্ত কালগত পরিমাপবিভাগকে 'তাল' (measure) বলে। তালরূপী ভূমিকায় গীত বাদ্য ও নৃত্য সংঘটিত হচ্ছে। প্রত্যেকটির রূপের—শ্রাব্য ও দৃশ্য রূপের সঙ্গে এই পরিমাপ জড়িত রয়েছে; একে পৃথক করে—অর্থাৎ শ্রাব্য বা দৃশ্য রূপ থেকে পৃথক করে দেখান যায় না। হাত দিয়ে তাল দেখাতে হলে হাতের গতি হয় দৃশ্য রূপ, শব্দ হয় শ্রাব্য রূপ; বাদ্যধ্বনি দিয়ে তাল দেখালে ধ্বনিগুলিই হয় শাব্দরূপ। তবুও বাদ্যগত ধ্বনিগুলির গুরুতা-লঘুতার জন্যই বিশেষরূপ ছন্দ সৃষ্টি হয় বলেই এবং মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্য-ধ্বনিগুলিই প্রকৃষ্টরূপে ছন্দ সৃষ্টি করতে পারে বলেই এই জাতীয় বাদ্যের ধ্বনির সঙ্গে তালের প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ। শব্দের গুরুত্ব লঘুত্ব এবং বিশিষ্ট পারম্পর্য দিয়ে যে বিশিষ্ট শাব্দরূপের সৃষ্টি হয়, তথা আন্দোলনেরই বিশিষ্ট এক একটি রূপ হয়, এই নিবদ্ধ রূপই হল ছন্দ। সংগীতের শাব্দ ও দৃশ্য রূপকে পরিমাপ করা হল তালে; তালকে গুরুলঘু ও পরম্পরা দিয়ে বন্ধন করা হল ছন্দে। অতএব সংগীত হল ছন্দোবদ্ধ। যেহেতু আমাদের সম্বিতেরই সহজ ধর্ম হল পরিমাণবদ্ধ ও ছন্দোবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি উন্মুখতা অতএব এই পরিমাপ-বদ্ধ ও ছন্দোবদ্ধ আন্দোলন ব্যাপার সংগীতের একটি সনাতন ধর্ম। পরিমাপ-বিভাগগুলি দেশকালভেদে পরিবর্তিত হতে থাকে, ছন্দও দেশকালগত রূপান্তরকে পেতে থাকে কিন্তু এদের আন্তরিক ধর্ম চিরন্তন, ও সর্বত্র বর্তমান থাকবে।

শিল্পী

শিল্পী, কলাবিৎ সংগীতকে পরিবেশন করছেন। এঁদের উপর উৎকৃষ্ট সংগীতের অভিব্যক্তির গুরুভার ন্যস্ত; অতএব এঁরা সমাজে সাধারণ ব্যক্তি হলেও সভায় সামান্য ব্যক্তি নন। গায়ক বাদক ও নর্তক শিল্পীদের আদর্শ চিন্তা করা হয়েছে। অবশ্য আচার্য উপাধ্যায় শিক্ষকশ্রেণীর ব্যক্তিরও কার্য স্বীকৃত হয়েছে, তাঁদের যথোচিত শ্রদ্ধা দেখান হয়েছে এবং তাঁদের বিষয়েও আদর্শ কল্পিত হয়েছে। তবুও একথা মনে রাখতে হয় যে, আচার্য উপাধ্যায়-গণের কার্য নেপথ্যে, সভায় নয়। শিল্পী অবতীর্ণ হন রঙ্গমঞ্চে, সভার মধ্যে, সামাজিকের সম্মুখে; তিনি গীতবাদ্যনৃত্যরূপ যে বস্তু সৃষ্টি করেন সেই বস্তু ক্ষণবিধ্বংসী, তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। গুণ বা দোষের সঙ্গে সেই বস্তুগুলি ক্ষণে আবির্ভূত হয়ে পরক্ষণেই অন্তর্ধান করছে। এই সকল শ্রাব্য ও দৃশ্য বস্তু ক্রমশ আবির্ভূত ও তিরোহিত হতে থেকেও সামাজিক ব্যক্তির অধ্যাত্মের মধ্যে একটি সমূহালম্বনাত্মক, মানসী, রঞ্জনাপ্রবাহ রেখে যাচ্ছে। বস্তুগুলির সমাবেশের, সম্বন্ধের ও পারম্পর্যের গুণ ও দোষ এই মানসী রঞ্জনাতেই বর্তিত হবে। গ্রন্থের অশুদ্ধি যেমন শুদ্ধিপত্র দিয়ে মেটানো যায়— এখানে মানসী রঞ্জনার দোষকে, অশোভনতাকে, অসমঞ্জসতাকে কিন্তু কোনও রূপ পরিবেশকালের কৈফিয়ৎ দিয়ে শোধন করা যায় না। সুতরাং শিল্পীকে অত্যন্ত সাবধান হতেই হবে।

গায়ক বাদক ও নর্তক—এই তিন জন কুশলী ব্যক্তির আদর্শ সম্বন্ধে যে পুংখানুপুংখ বর্ণনা আছে তাকে সমগ্রভাবে চিন্তা করলেই সিদ্ধান্ত হয় প্রাচীনগণ শিল্পীকে তার সামাজিক ব্যক্তিত্ব থেকে তুলে ধরে একমাত্র উৎকর্ষের আলোকেই পরীক্ষা করেছেন। সমাজে সেই ব্যক্তি মহাপুরুষ কিনা, হবিষ্যান্নভোজী কিনা, অথবা নিতান্তই সাধারণ ব্যক্তি কিনা— প্রাচীনগণ এরূপ চিন্তার দিক দিয়েও যান নি। নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে

সংগীতপারিজাত পর্যন্ত (সপ্তদশ শতাব্দী) কোনও সংগীত-গ্রন্থের মধ্যে ঘৃণাক্ষরেও কোনও শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস ত দূরের কথা, উল্লেখমাত্রও নেই। এ বিষয়ে প্রাচীনদের চিন্তার সূত্রটিকে সরল ও সংক্ষিপ্ত রূপে গ্রহণ করে বলতে হয়, সভা ও রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে যে ব্যক্তিটি জীবন যাপন করছে তার সঙ্গে শিল্পসমালোচনার কোনও সম্বন্ধ নেই ; এবং সভায় ও রঙ্গমঞ্চে যিনি সংগীত পরিবেশন করছেন সেই ব্যক্তির অবতারণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র সংগীতসংঘটনার কারণে। অতএব তাঁর কৃতিত্বই একমাত্র আদর্শ হতে পারে এবং সমালোচনার বিষয়ভুক্ত হতে পারে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কখনও শিল্পপক্ষে আদর্শ হতে পারে না বা সমালোচনার বিষয়ীভূত হতে পারে না। আজকের দিনের সমালোচন মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় প্রাচীনেরাই সঙ্গত চিন্তা করেছেন। শিল্পী কখন কি করেন, কোথায় মাছ ধরেন, কখন ডনবৈঠক্ করেন, কিরূপ ও কতবার বিবাহ করেছেন প্রভৃতি আবর্জনা সৃষ্টি করে সামাজিক ব্যক্তির দৈনন্দিন চিন্তাপ্রবাহকে অকারণে উদ্বেলিত করবার প্রয়াসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গীতশিল্প সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে উপদেশ করা হয়েছে স্ত্রীলোকেরাই গান করবেন এবং পুরুষেরা বাদ্য করবেন, কারণ স্বভাবত স্ত্রীকণ্ঠ সমধিক মধুর ও সংগীতোপযোগী। যাকে স্বভাবে পাওয়া যায় তাকেই মার্জিত করে গীতোপযোগী করার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠোচ্চারিত ধ্বনির দোষ-গুণের কথাও বলা হয়েছে। রত্নাকরে বিশেষ করে গুণবর্ণনা আছে—যথা গায়ক হৃদ্যশব্দ, অর্থাৎ সুকণ্ঠ এবং সুশারীর অর্থাৎ সুন্দরশরীরযুক্ত হবেন, গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ অর্থাৎ গানের আরম্ভ ও ত্যাগবিষয়ে সম্যক অভ্যস্ত, রাগ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ, গান ও গীতরূপ সকল ও নানারূপ আলাপে কুশলী, উদার মন্দ্র ও তার স্থানে (উদারা মুদারা ও তারার স্বরে) প্রকৃষ্ট শব্দের সঙ্গে গমকাদি (কতকগুলি বিলক্ষণ স্বরোচ্চারণরূপ) অনায়াসে নিষ্পন্ন করতে সমর্থ, কণ্ঠজ শব্দের মৃদুতা ও উচ্চতাকে আয়ত্ত করে প্রকাশ করতে

পারগ, তালজ্ঞ, সাবধান, গীতোপযোগী শ্রমে অভ্যস্ত, শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন হয় এরূপ গান করতে কুশলী হবেন ইত্যাদি। সাবধানের অর্থ এই, গায়কের পঁচিশ রকম মুদ্রাদোষ বর্ণিত হয়েছে। সে দোষ যাতে না হয় এ বিষয়ে সাবধান। এই গুণগুলি স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শিল্পী সম্বন্ধেই চিন্তনীয়।

নাট্যশাস্ত্রে মুদ্রাদোষের বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার কারণ এই হতে পারে ভরত কালিদাসের যুগের সংগীতে স্ত্রী-শিল্পীরাই গান করতেন। অবশ্য পুরুষেরা যে গান করতেন না এমন নয়; গোষ্ঠীতে, নিজের বা বন্ধুর বাড়ীতে, এবং আবেগবশে—যে সকল সাধারণ গান হয় এবং যা চিরকাল সর্বত্র হয়—সেরূপ গান পুরুষেরাও করতেন। 'রেভিল' নামক পুরুষ মধুর কণ্ঠে গান করছেন, এবং চারুদত্ত ও তাঁর বিদূষক বন্ধু শুনছেন ও মন্তব্য করছেন—এরূপ চারুদত্ত নাটকে পাওয়া যায়। কিন্তু সংগীতের পরিকল্পনায় গান-কার্য বিষয়ে স্ত্রীলোকদের স্থান ছিল প্রথমে, পুরুষেরা গাইতেন অভাবপক্ষে অথবা নাটকীয় ভূমিকার অধীন হয়ে। ঐ সময়ে গোষ্ঠীতে, প্রকাশ্যভাবে পথে-ঘাটে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে অবাধে নিঃসঙ্কোচে চলা-ফেরা করতেন; যাবতীয় উৎসবে স্ত্রীলোক ছিলেন পুরুষের সহযোগী সহধর্মিনী ও সহানুভবী। কয়েক শতাব্দী পরে শার্ঙ্গদেবের সময়ে স্ত্রীলোক অন্তঃপুরবাসিনী হয়েই কালাতিপাত করেছেন বিজাতীয় বৈদেশিক সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবার জন্য। ফলে পুরুষদেরই উপর গান করার ভার পড়ল। পুরুষের স্বভাবের মধ্যে, আকার ইঙ্গিতের মধ্যে এমন একটি হঠকারিতা আছে যাকে আমরা পৌরুষ বলে গর্ব অনুভব করি, যাকে সাধারণত লুকিয়ে রাখলেও আবেগের অবস্থায়, গান করার সময়ে অসাবধান হলেই নানারূপ অনুচিত অঙ্গ-চেষ্টা ও মুখবিকৃতির মধ্যে সেটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অন্যপক্ষে স্ত্রীস্বভাবের মধ্যে এমন একটি স্নিগ্ধতা আছে, একটি শোভনতার সংস্কার আছে যার ফলে বিকৃত চেষ্টাদি সম্ভব হয় না যদিও

পুরুষগুরুর অনুকরণদোষে কদাচিৎ কখনও অজ্ঞাতসারে স্ত্রী-গায়কের পক্ষেও এরূপ দোষ কৃত্রিমভাবে আহরণ করা সম্ভব। শার্ঙ্গদেবের সময়েই—গানের মধ্যে মুখাদির বিকৃতি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, এবং শাস্ত্রকার সাবধান করে দিয়েছেন। তিন শতাব্দী পরের কয়েকটি ধ্রুবপদ গানে—"শুধ্ মুদ্রা শুধবাণী" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উৎকৃষ্ট গানের আদর্শের সূচনা তথা গায়কদিগকে বিকার থেকে সাবধান হবার উপদেশ লক্ষিত হয়। সংগীত পারিজাতে এসকল কথাই নেই; শাস্ত্রকার হাল ছেড়ে দিয়েছেন, কেই বা কার কথা শুনে! সম্প্রতি মুদ্রাদোষ গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; মুদ্রাদোষ দেখে বলে দেওয়া যায় গায়ক কোন বা কার ঘরোয়ানার ছাত্র! একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, গীত ব্যাপার যতক্ষণ বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সকল দোষের আবির্ভাব হওয়া কঠিন। যখনই গীত ব্যাপার বাদ্য ও নৃত্য-নিরপেক্ষ হয়, এবং শিল্পীর পক্ষে বৃন্দ-জ্ঞান (Team Sense) অপসারিত হয় তখনই এদের উৎপত্তি সম্ভব। পূর্ণাঙ্গ সংগীত ব্যাপারে এখনও যা আমরা মাঝে মাঝে পাই তাতে এ সকল দোষের অবকাশ নেই। একক গীত ব্যাপারে এ সকল দোষ সম্ভব হচ্চে প্রত্যক্ষ।

বাদকের পক্ষে কতকগুলি গুণকে আদর্শ মনে করা হয়েছে যার মধ্যে দুটি বিশেষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি "পাত্রাভিপ্রেতবাদকঃ", অন্যটি "গীতবাদননৃত্যস্থছিদ্রচ্ছাদন পণ্ডিতঃ"। প্রথমটির অর্থ পাত্রের অর্থাৎ নর্তক-নর্তকীর অভিপ্রায়কে বৃত্তি তাল ও ছন্দ বিষয়ে—বুঝে বাদ্যে অনুবর্তন করা। এখানে নৃত্যপ্রধান পরিকল্পনা সূচিত হয়েছে। অন্যটির অর্থ গীত বাদ্য ও নৃত্যের ত্রুটি আবরণ করে নিতে কুশলী। সংগীত ব্যাপারে কিছু না কিছু ত্রুটি হয়ে পড়েই; তার মধ্যে তালগত ত্রুটি ছন্দ দিয়ে ঢেকে নেওয়া যায় এবং স্বরগত ত্রুটি বাদ্যস্বর ও ধ্বনি দিয়ে আবৃত করা যায়। বলাই বাহুল্য, বড় রকমের ত্রুটিকে আচ্ছাদন করা যায় না। এখন পর্যন্ত সংগীতের

ব্যাপারে বাদক নৃত্য ও গানের ত্রুটিকে আচ্ছাদন করছেন ; সাধারণ ব্যক্তি বুঝতে পারেন না, সহৃদয় সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি বুঝতে পারেন।

নর্তনকারীকে পাত্র বলা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইনি নর্তকী। নাট্য-প্রধান ব্যাপারে তাণ্ডব জাতীয় নৃত্তে নর্তকের প্রয়োজন হয়। তবুও নৃত্তের প্রশস্ত পাত্র মনে করা হয়েছে স্ত্রীলোককে। এর আদর্শ গুণের মধ্যে প্রথমেই যৌবন বয়স ও অঙ্গসৌষ্ঠবাদির সূচক বিশেষণ সকল চিন্তা করা হয়েছে ; এই দৈহিক গুণ সকল এরূপ সুন্দর ও সুশোভন যে এদের একত্র সমাবেশ বিরলই মনে করতে হয়। কিন্তু একথা ভেবে হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। শেষের দিকে এরূপ কথা আছে যাতে দৈহিক গুণের অভাব স্থলেও সর্বপ্রকার সুচারুতার সম্ভব। যথা 'লাবণ্যকান্তিমাধুর্যধৈর্যৌদার্য-প্রগল্ভতা।' এর মধ্যে এক লাবণ্যই সকল রকম অভাবদোষ নাশ করে। 'কান্তি' কৃত্রিম বস্তু দিয়ে সম্পাদিত হতে পারে। মাধুর্য গুণটি বৃত্তি শিক্ষা বা মনোভাবের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ধৈর্যও মনোভাবের শিক্ষা, ঔদার্যও তদ্রূপ। প্রগল্‌ভতার অর্থ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহসিকতা, এমন কি নির্লজ্জতা পর্যন্ত। অবশ্য এই নির্লজ্জতারও প্রয়োজন আছে ; অকস্মাৎ কোনও ত্রুটি হয়ে গেলে যদি শিল্পীর মনে লজ্জা ভয়াদি হয় তাহলে সংগীত ব্যাপারটি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। ঔদার্যের প্রয়োজন এজন্য যে বাদক বা গায়ক কিছু দোষ করে ফেললেও সে বিষয়ে ক্রোধ না করাই শোভন ; এবং সভায় মূর্খ লোক যদি ক্ষণিকের জন্য সংগীতের বাধা সৃষ্টি করে তাহলে ধৈর্য ও ঔদার্য দুটি গুণেই শিল্পী প্রকৃতিস্থ থাকবেন। সার কথা—লাবণ্য কান্তি মাধুর্য ধৈর্য ঔদার্য ও প্রগল্ভতা থাকলে নর্তকী তার কার্যোদ্ধার করতে পারে অর্থাৎ সংগীতের উদ্দেশ্য যে মনোরঞ্জনা সামাজিক ব্যক্তি তা লাভ করে।

চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য

এ পর্যন্ত আমরা প্রাচীন আচার্যদের সংগীতবিষয়ক চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলাম। বহু প্রকার সূক্ষ্ম চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি এই সকল বড়রকমের চিন্তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও সুসংবদ্ধ হয়ে মিলিত হয়েছে; এদের আলোচনার স্থান নেই। বাস্তবিক সংগীতরত্নাকরে যাবতীয় বিষয় ও প্রকরণের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাগুলির পরিপাটী, প্রস্থান, বর্ণনা ও যুক্তিযুক্ততা ধীরভাবে অনুশীলন করলে এই ভেবে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় যে, একটি ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানের এতখানি বিশদতা, ব্যাপকতা, ও সূক্ষ্মতা কি করে সম্ভব ? তখন মনে হয় গ্রন্থকর্তা পূর্বাচার্যগণের কথাগুলিকেই ঢেলে সাজিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন একই থেকে যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রতি অভিনিবেশ করলে, তাঁর বিচিত্র বিষয়াবগাহী, সূক্ষ্মতর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সঙ্গে এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশাত্মক বর্ণনাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলেই মনে হয় এরও বহু পূর্বে চিন্তা ও দর্শনের অনুশীলনগুলি হয়ে গিয়েছে এবং ভরতের সময়েই বিধিবদ্ধ ব্যাকরণপ্রচেষ্টা সম্ভব হয়েছে। না হয় এই আচার্যগণের কথা স্বীকার করে বিশ্বাস করতে হয় চতুর্বেদের মধ্যে এবং আগম ও তন্ত্রের মধ্যেই সবকিছু আছে, ব্রহ্মাদি সেগুলি অন্বেষণ করে উদ্ধার করেছেন এবং ভরত প্রভৃতি ব্যক্তি সেগুলি নির্বাচন করে প্রয়োগযোগ্য করে গিয়েছেন। যতই পূর্বে গমন করা যায় ততই চিন্তার সমৃদ্ধি ও ঔজ্জ্বল্য যেন ক্রমশ সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার মত প্রতিভাত হয়। বেদ হলেন এই সূর্য, সকল মন্ত্রের সর্ব জ্ঞানালোকের আধার। আমরা সাধারণ লোক যেমন সূর্যের দিকে তাকাতে পারি না কিন্তু প্রস্ফুটিত কমল, বৃক্ষলতা ও নিসর্গের মধ্যে সূর্যের কীর্তিচ্ছটাকে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করে চমৎকৃত হই তেমনি মনে করতে হবে যে ঋষিরা ঐ বেদমন্ত্রকে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, আচার্যগণ সেই ঋষি-প্রত্যক্ষকেই মূল

প্রামাণিক আদর্শরূপে সংগ্রহ করে গিয়েছেন এবং কবিরা তাদিগকে বেছে নিয়েই কবিত্বরূপ প্রস্ফুটিত কমলগুলি উপহার দিয়ে গিয়েছেন।

শার্ঙ্গদেব গ্রন্থারম্ভে পূর্বাচার্যগণের বা সংগীতবিশারদগণের নামোল্লেখ করেছেন। হয় তো এই আচার্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেই সংগীত-বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে গিয়ে থাকবেন; নতুবা তাঁরা সম্প্রদায়কর্তা ছিলেন এবং তাঁদের মতসকল গুরু-শিষ্যপরম্পরায় চলে এসে পরে, অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রের কিছু পূর্ব থেকে রত্নাকরের সময়ের মধ্যে গ্রন্থের আকার ধারণ করেছিল। যে রকমেই হোক সংগীত বিষয়ে অত্যন্ত বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়ে গিয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। শার্ঙ্গদেব এরূপ চল্লিশ জন সংগীতবিশারদ, বা সংগীতের ব্যাখ্যাকর্তার নামোল্লেখ করেও বলছেন—'অন্যে চ বহবঃ পূর্বে যে সংগীতবিশারদাঃ' অর্থাৎ পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের অতিরিক্ত আরও অনেক সংগীতবিশারদ যাঁরা পূর্বকালে ছিলেন' ইত্যাদি। এরূপ উক্তি থেকে প্রমাণ হয় যে, ভরতের পূর্ব থেকেই বহু চিন্তাশীল ও সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি গীত বাদ্য ও নৃত্ত সম্বন্ধে তিনটি পৃথক করে, বা একই করে নানারূপ অনুশীলন ও চিন্তা দ্বারা কতকগুলি বিধিবদ্ধ মত ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন।

গ্রন্থীকৃত অথবা গ্রন্থে উল্লিখিত এই সকল মত, সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগ-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় হলে সকলের আগে একটি কথা মনে হয়। প্রাচীনেরা পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিক বা বস্তুবাদী ছিলেন। বস্তুতান্ত্রিকতা বা বস্তুবাদিতা বলতে এই বুঝি যে, ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির চিন্তা করে বস্তু চিন্তা করা, বস্তুবিশেষের যোগাযোগ কল্পনা করা, বস্তু সকলের গুণাগুণ, লক্ষণ বিচার ও পরীক্ষা করা, কিরূপ বস্তু আহরণ করতে হবে, তাদের যোগাযোগই বা কিরূপ হবে ও হওয়া উচিত, পরিশেষে এই সমাবেশগুলিকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিক দিয়ে বিচার করে প্রয়োগাধীন করা ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, প্রাচীনগণ তাঁদের যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলিকে এমন করে সজ্জিত করে রেখে গিয়েছেন যাতে উত্তর-কালের কোনও অনুসন্ধিৎসুর অসুবিধা না হয়।

এই বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাজালের কেন্দ্রবর্তী মূল ও সূক্ষ্মতম বস্তুরূপে 'নাদ'কে চিন্তা করা হয়েছে। এবং সমগ্র চিন্তাজালের পরিবেষ্টনীর বিষয়ীভূত, মিশ্র, কৃত্রিম বস্তুই সংগীত বস্তু, অর্থাৎ গীতবাদ্যনৃত্তরূপ বস্তু। অবশ্যই এই সমগ্র মিশ্রবস্তুর প্রভাব সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়েছে—বিলক্ষণ বা বিশিষ্ট রঞ্জনা এবং সম্বিতের অধিকারে রসোৎপত্তি।

সংগীত-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

যাই হোক, আমাদের মনে একটি প্রশ্ন উঠে। গ্রন্থোল্লিখিত আভ্যুদয়িক ও উৎকর্ষ-সংগীত সম্ভব হয় হোক; তবুও গীতবাদ্যনৃত্ত ব্যাপারগুলি স্বাভাবিক স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবেই হয়ে থাকে; যেমন মতঙ্গ বলেছেন 'অবলাবালগোপালৈঃ ক্ষিতিপালৈর্নিজেচ্ছয়া' অর্থাৎ স্ত্রীলোক, বালক, গোপাল ও রাজা এরা ইচ্ছানুরূপ গানে প্রবর্তিত হয়, শাস্ত্রের অপেক্ষা করে না। অতএব এ বিষয় নিয়ে এত গ্রন্থ, এত শাস্ত্র লিখবার প্রয়োজন কি? নিয়মের জটিলা ও সিদ্ধান্তের কুটিলাকে এই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে টেনে এনে এদের লীলারূপকে (sportive element) নষ্ট করে লাভ কি? আমাদের এমনও সন্দেহ হতে পারে যে প্রাচীন আচার্যগণ একটু বাড়াবাড়ি করতে ভালবাসতেন।

প্রাচীনদের দার্শনিক দৃষ্টি এবং বিশেষভাবে সংগীতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ধীরভাবে প্রবেশ না করলে আমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না, এবং মনে সন্দেহ থেকে যায় যে প্রাচীনগণ বাহুল্যপ্রিয় ও বাগবিস্তার-পটুই ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষেপে পরিচয় প্রয়োজন; এ বিষয়ে চেষ্টা না করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়।

প্রাচীন ঋষি ও আচার্যগণ গীতবাদ্য প্রভৃতির স্বাভাবিক শৃঙ্খলাহীন প্রচেষ্টা ও লীলারূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত ছিলেন। পর্যকিকাশায়িত, রোদনপরায়ণ শিশু মায়ের ঘুমপাড়ানি গান বা অন্য সাধারণ গান শুনে হর্ষিত

হয় বা ঘুমিয়ে পড়ে, এরূপ কথা গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে। অধিকন্তু পুরাণ-মহাকাব্য ও কাব্যের মধ্যে স্বভাববর্ণনা প্রসঙ্গেও বুঝা যায় যে তাঁরা প্রাকৃত চেষ্টা ও তার সৌন্দর্যকেও লক্ষ্য করে গিয়েছেন। উপমা সংগ্রহ বিষয়ে তাঁদের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল, আর সুন্দরতাকে আহরণ করবার ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ কেউ ছিল কিনা সন্দেহ।

গীত বাদ্য নৃত্ত স্বভাবেও নিষ্পন্ন হতে পারে ও হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। জিজ্ঞাসা করি, আমরা আহার বিহারাদি জৈব ব্যাপার বিষয়ে নির্বাচনপন্থী, না 'যা পাই তাই খেলাম', 'যা জোটে তাই পরলাম', 'যেখানে-সেখানে শুলেই হল'—এরূপ পন্থার পন্থী? শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিকে হয় উন্মাদ বলতে হয়, না হয় ব্রহ্মজ্ঞ, উচ্চস্তরের সাধক মনে করতে হয়। যাই হোক, এঁদের মত লোকের জন্য শাস্ত্র-চিন্তা হয় নি।

আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ জৈব ব্যাপারে নির্বাচনপন্থাবলম্বী ব্যক্তি। বেশ কথা, কিন্তু প্রাচীনেরা জৈব ও জৈবোত্তর (Suprabiological) উভয় বিষয়েই নির্বাচনপন্থী ছিলেন। প্রাচীন আস্তিক্যমতাবলম্বী ঋষি ও আচার্যগণ ইহলোক পরলোক উভয় বিষয়েই চিন্তা করে গিয়েছেন। সমাজবদ্ধ ব্যক্তি কিরূপ কার্য করলে, কিরূপ ভাবনা করলে তার ইহলোক ও পরলোক উভয় পক্ষে কল্যাণ সাধিত হয়, এবং জীবাত্মা ক্রমে ক্রমে উন্নততর অভিব্যক্তিকে পেতে পারে তার চিন্তা হয়েছে, উপায়ও প্রদর্শিত হয়েছে।

উপনিষৎ, দর্শন-পুরাণাদিরূপ যে মহাসমুদ্র থেকে ভরত ও শাঙ্গর্দেব সারোদ্ধার করেছেন সেই মহাসমুদ্রেরই একটি অঞ্জলিকৃত সমুজ্জল সিদ্ধান্ত শাঙ্গর্দেবের কথানুযায়ী প্রতিপাদিত করা গেল। এর সরলার্থ এরূপ :

"চিদানন্দ স্বয়ংজ্যোতি, নিরঞ্জন ব্রহ্ম আছেন; তাঁকে ঈশ্বর অলিঙ্গ, অদ্বিতীয়, অজ, বিভু, নির্বিকার, নিরাকার, সর্বেশ্বর, অনশ্বর, সর্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ বলা হয়। জীব সকল তাঁহারই অংশ। যেমন তেজরূপ একই অগ্নি কাষ্ঠ, তৃণ, পত্র প্রভৃতি ভিন্নরূপ উপাধিযুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্ফুলিঙ্গরূপ বোধ হয়,

সেইরূপ অনাদি অবিদ্যা দ্বারা উপহত হয়ে জীব সকল ব্রহ্ম হতে ভিন্ন বোধ হয়। এরা সুঃখদুঃখপ্রদ, পাপপুণ্যরূপ অনাদি কর্মসকল দ্বারা বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রতিজন্মে যথারূপ কর্মজ জাতি, দেহ, আয়ু ও ভোগ লাভ করে। উপরন্তু জীবনের অন্তরালে সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করে। এইরূপ অর্থাৎ একবার স্থূলশরীর ও পরে সূক্ষ্মদেহ পরিগ্রহ ব্যাপার বারবার হতে থাকে যতদিন পর্যন্ত মোক্ষ লাভ না হয়"

জগতের অধিকাংশ জীবের পক্ষে এই সুখদুঃখমোহরূপ বা অবিদ্যারূপ নিজকৃত কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে যে সংসরণ ঘটনা বা অবস্থা হচ্ছে প্রাচীন ঋষিগণ ধ্যানদৃষ্টিতে তাকে দেখেছিলেন। পরবর্তী দার্শনিকগণ ঋষি-দৃষ্টিকে যুক্তিদ্বারা পুষ্ট করে বিরাট চিন্তা-সৌধ নির্মাণ করে গিয়েছেন যা আরম্ভবাদ (ন্যায়দর্শন), পরিণতিবাদ (সাংখ্যদর্শন) এবং বিবর্তবাদরূপ (বেদান্তদর্শন) ত্রিস্তরীকৃত ভিত্তির উপর এখনও অচল অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বহুকাল থাকবে, অন্তত যতদিন চিন্তাশীল মানব থাকবে।

অধিকাংশ জীবেরই ঐ দুর্গতি হচ্ছে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিবেষ্টনী যতই ইহসর্বস্ব ও সুব্যবস্থিত হোক। মাত্র অল্পসংখ্যক ব্যক্তি কোনও সুকৃতি, সাধনা বা কৃপার সাহায্যে চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং ঐ আনন্দে নিজেকে লীন করতে পারেন। এই অল্পসংখ্যক যাঁরা কর্মজালকে ছিন্নভিন্ন করে আত্মাকে পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত করেন এঁদের জন্য চিন্তা নেই। চিন্তা অধিকাংশ সামাজিক জীবকে নিয়ে; কিসে তাদের পরমাত্মন্-বস্তুতে প্রত্যাবর্তন হয়, কিরূপ ব্যবস্থা করলে তাদিগকে এ আনন্দের আস্বাদ দেওয়া যায়, ঐ দিকে প্রলোভিত করা যায়, ঐ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু করা যায় ইত্যাদি। কর্মপ্রবৃত্তি বশে এরা বিষয়লুব্ধ ও বিষয়মুগ্ধ হতে থাকবেই, অথচ এ সকলের অবকাশে তাদিগকে কি উপায়ে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে প্রলোভিত করা যায় এই হল ঋষিদের সমস্যা।

এর মীমাংসাকল্পে ঋষিগণ দু-রকম উপায় দেখিয়ে গিয়েছেন। কোনও বস্তুর সম্বন্ধে দু-রকমে জ্ঞান হতে পারে। এক, সেই বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্দোষ আলোচনা করে, অনুশীলন করে। একে বৃত্তিজ্ঞান বলে। অন্যটি সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার বা আংশিক, প্রত্যক্ষ পরিচয় বা আস্বাদ লাভ করে। একে উপলব্ধ জ্ঞান বলে। এদের মধ্যে প্রথমটি মার্জনা আলোচনা সাপেক্ষ, অর্থাৎ জ্ঞানের জন্যই বিশেষ সাধনা, তপস্যা, গুরুর সহায়তা ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। সামাজিক ব্যক্তি সকলেই কিছু বৃত্তি-জ্ঞানের পন্থা অবলম্বন করে ব্রহ্ম বিষয়ে পরিজ্ঞাত হতে পারে না। অতএব অন্যটিই অবলম্বনীয়।

সাধারণ সামাজিক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই যে পুরাণভাগবত-কথা, লীলা-কীর্তনাদির ও উৎকৃষ্ট সংগীতের শ্রবণ, এবং মহাকাব্য, কাব্য-নাটক ইত্যাদির উপভোগ ব্যবস্থিত হয়েছে এবং এই সব ব্যাপারের মধ্যে দিয়েই যে ব্রহ্মস্বরূপ নির্মল আনন্দের পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ব্রহ্ম স্বয়ং রসবস্তুর পরকাষ্ঠা। সংগীতাদির শ্রবণ থেকে, উত্তম নাট্য-দর্শন থেকে সাক্ষাৎভাবে সামাজিক জীবের মধ্যে ক্রমশ অনির্বচনীয় রস-লোলুপতা ফিরে আসুক। এই লোলুপতাই সাধারণ ব্যক্তির অধ্যাত্মকে অধিবাসিত করুক এবং প্রতি জন্মে এই বাসনারই সঞ্চয় হতে থেকে শেষে কোনও দিন তার চরম ইপ্সিত বস্তুকেই সহজলভ্য করুক। স্থূল হতে সূক্ষ্মতর বস্তু তথা ভাবের সঙ্গে সূক্ষ্ম পরিচয় ঘটুক। তার ভোগলোলুপতারই আশ্রয়ে—এই হল ঋষিদের অভিপ্রায়। সামাজিক জীব যেরূপ অবস্থায়, যেরূপ বিড়ম্বনাতেই দিনযাপন করুক মধ্যে মধ্যে সে যাতে উপাদেয় রসবস্তুর ক্ষণিক আস্বাদনেও নিমগ্ন হতে পারে তারই উপায় চিন্তা করা হয়েছে।

সাধারণ সামাজিক ব্যক্তিকে যদি উৎকৃষ্ট বস্তুরই আস্বাদ দিতে হয় তা হলে সেই বস্তুটি যাতে উৎকৃষ্ট হয় তার চিন্তা ও চেষ্টা করতে হবে। জীব ত ইতি-পূর্বেই রজোগুণের বশে ক্ষিপ্তের মত বা তমোগুণের বশে সুপ্তের মত ব্যবহার করতে করতে জীবনের শেষ সীমায় এসে পড়ছে। এর জন্য কি এমন

প্রয়োগ পরিবেশন কাম্য হবে যাতে তার চাঞ্চল্য বাড়ে বা জড়তার বৃদ্ধি হয় ? স্বভাবের স্থষ্টির মধ্যে কি আহার্য পরিধেয় যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তুকে পাওয়া যায় ? না, বস্তু নির্বাচন করে আহার্য পরিধেয় চিন্তা করতে হয় ? সেইরূপ সংগীতের প্রয়োগ পরিবেশন বিষয়ে একথা মনে না রেখে সামাজিক ব্যক্তির সামনে সংগীতের নামে যথেচ্ছা প্রকল্পিত বস্তুকে পরিবেশন করলে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত পাপকে বা অকল্যাণকেই বাড়ান হবে। এও যেমন সত্য তেমনি রসহীন রুক্ষ আশোভন বস্তুকে পরিবেশন করলে যদি সামাজিক ব্যক্তি বিরূপ হয়ে বস্তুকেই ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় তা হলেও ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই কারণেই সংগীতের মধ্যে উচিত ও ললিত উভয়ের চিন্তা হয়েছে। সংগীতের মধ্যে তিক্ত, সালসাজাতীয় দ্রব্য চিন্তা করা হয়নি ; মাত্র উচিত ও মধুর বস্তুকেই চিন্তা করা হয়েছে।

শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন। তিনি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েই সুন্দরকে, শোভনকে, মনোরমকে পরিবেশনচ্ছলে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে থাকবেন। শিল্পীর জন্যই নাট্যশাস্ত্র, রত্নাকর প্রণীত হয়েছে যার মধ্যে উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত সকল আশ্রয় করে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ-পদ্ধতির ব্যবস্থা বর্ণনা ও উপদেশ আছে। এই কথা চিন্তা করলে তবে আমাদের সন্দেহ দূরীভূত হতে পারে। শাস্ত্রকার ও প্রাচীনগণ বাহুল্যপ্রিয় বা বাগ বিস্তারপটু মাত্র ছিলেন না। তাঁরা কখনও একথা বলছেন না যে প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তি সংগীত-সভায় আসন পরিগ্রহ করার পূর্বে নাট্যশাস্ত্র বা রত্নাকর মুখস্থ বা হৃদয়ঙ্গম করে প্রস্তুত হয়ে আসবে। সংগীত তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে ও তার সরসতা দিয়েই সাধারণের প্রবৃত্তির অনুকূলে সত্য ও সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করাবে।

দার্শনিক ভিত্তি

প্রাচীন আচার্যগণ সংগীতের প্রভাব সম্বন্ধে বিশিষ্ট রূপ দার্শনিক চিন্তা করে গিয়েছিলেন। এই চিন্তাকে সাধর ণ ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

কাব্য, নাটক ইত্যাদির উৎকর্ষ ব্যাপারকে অবলম্বন করে ভরত থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে বিরাট্ রসসাহিত্য গড়ে উঠেছে, দার্শনিক জ্ঞানের সূক্ষ্মতার ও যথার্থতার দিক দিয়ে পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। তবুও এর আলোচনা করতে গিয়ে একটি তর্জনী-সংকেত দেখে আমরা বিষণ্ণ হই। সাধারণ ব্যক্তি রসাস্বাদের অধিকারী নয়, একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিই রস প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সাধারণ ব্যক্তি কাব্য ও নাটকাদি পড়ে বা দেখে কিঞ্চিৎ চমৎকৃতি আস্বাদন করতে পারে, কিন্তু রসবস্তু নাকি তার জন্য নয়!

যদিও সংগীতের প্রভাবে রসসৃষ্টি হতে পারে তবুও সংগীত ব্যাপারে আনন্দ লাভ করা এমন একটি সার্বজনীন প্রত্যক্ষ যা প্রাচীনগণের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি এবং এ বিষয়ে এমন একটি বিশিষ্ট চিন্তা হয়েছে যা রসশাস্ত্র বা অলঙ্কারশাস্ত্রের রসচিন্তা থেকে অভিনব এবং সাধারণের পক্ষে বিষাদ-জনক নয়। একে সংগীতের শক্তি বলা যেতে পারে।

রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ যে সম্বিৎসিদ্ধ রসবস্তুকে প্রতিপাদিত ও সিদ্ধ করেছেন তাকে নানারকমে আলোচনা করে শেষে মনে হয় এই রসবস্তুই যদি আনন্দ হয়, তা হলে এই আনন্দ জ্ঞানেরই আনন্দ। কিন্তু যে রকমেই হোক এর স্বরূপকে বুঝা যায় না; এজন্য একে অনির্বচনীয়, চমৎকারস্বরূপ প্রভৃতি উপাধি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে যেগুলি শাব্দিক প্রত্যয় মাত্র। ঋষিগণ আনন্দকে সাক্ষাৎ করে তাকে বুঝাবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করেছেন,

উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা এমন একটি পথে চিন্তাকে প্রবাহিত করেছেন যা সংগীতের প্রভাবপ্রসঙ্গে নিতান্তই আলোচ্য।

শার্ঙ্গদেব গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের ব্যপদেশে নাদতনু পরমেশ্বর শঙ্করের শরণাপন্ন হয়েছেন। এই নাদতনু শঙ্করের চিন্তাই বক্ষ্যমান চিন্তা।

ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের বা মহাদেবের জগৎরূপে প্রকাশ, মূলে স্পন্দনধর্মী বা উল্লাসধর্মী; প্রাচীন শক্তিবাদীগণ এইরূপ আরম্ভ চিন্তা করেছেন। প্রকাশাবস্থার মূলগত এই রূপকে 'নাদবস্তু' মনে করা হয়েছে। যেহেতু এই রূপ বা ধর্ম থেকে রূপবান বা ধর্মীকে পৃথক কল্পনা করা অসম্ভব, অতএব নাদই ব্রহ্ম, অথবা পরমেশ্বর নাদতনু। এই ব্রহ্মস্বরূপ মূল নাদবস্তু থেকে বিস্তার (extension), বিচ্ছুরণ (radiation) ও বিকাশই (manifestation) স্থূলরূপে জগদবস্থার কারক। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যে আকাশবস্তু (এটা কিছু শূন্য বা নাস্তিমূলক নয়) তাও এই নাদবস্তুর একটি প্রাথমিক প্রকাশ বা বিস্তারোন্মুখ কৃতি (process of extension) মাত্র। আমাদের পক্ষে সাধারণভাবে গ্রহণীয় অথচ সূক্ষ্মতম বস্তু বলেই ব্রহ্মকে বুঝতে চেষ্টা করে কখনও বা আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন একটি বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়ে তার আকার ক্রমশ বৃহত্তর হতে থাকে সেইরূপেই আকাশের সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে এরূপ কথা পুরাণে পাই। যাই হোক, মূল নাদবস্তুর ক্ষান্তিও যেরূপ অচিন্তনীয়, এর আদিও সেইরূপ অভাবনীয়। জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে অণুপরমাণু, জীবাত্মা, দিক, কাল, মনে এই মূল বস্তুরই প্রসর্পণ, প্রবাহ বা বিকাশরূপ হয়েছে। মানুষের শরীর ও অধ্যাত্মের মধ্যেও এই প্রসর্পণ প্রবাহ বা বিকাশাবস্থা আছে; আবার বহির্জগতে গ্রহনক্ষত্রতারকাদির রূপে, পৃথিবীর রূপে, আলোক, বাতাস ইত্যাদির রূপে এই মূলবস্তুই বিকশিত হচ্ছে। যেমন ময়ূরের ডিমের মধ্যে যে অব্যক্তরূপ বর্ণবৈচিত্র্যহীন একটি সাধারণ রস পরে বিচিত্র বর্ণচ্ছটাযুক্ত

সুন্দর ময়ূরপক্ষীতে বিকশিত হয় সেই রকম পরমেশ্বরের অব্যক্ত অবস্থাই নিজের শক্তিতে পরে ব্যক্ত 'জগদবস্থা' পায়।

এই নাদবস্তুর ব্যঞ্জনার অবস্থাকে ধ্বনিও বলা হয়েছে। এই ধ্বনিপ্রবাহ যার অব্যাহত প্রকাশ অতিসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অতীত, তাকে 'অনাহত' বলা হয়েছে। কোথাও আঘাত নেই সেজন্য অনাহত। ঋষি ও যোগিগণ সাধনার দ্বারা একে অনুভব করতে পারেন; জগতের দিকে বহির্মুখী অনুভব প্রবাহে একে পাওয়া যায় না। বলা হয়েছে এই অনাহত ধ্বনি অরঞ্জক সুতরাং একে দিয়ে সংগীতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

ঐ একই ধ্বনি আহত বা আঘাতগ্রস্ত বা ব্যঞ্জিত হলে বস্তু সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ধারণ করে। সাধারণ প্রত্যক্ষ যা কিছু রূপ, শব্দই হোক বা দৃশ্যই হোক, এই আহত ধ্বনির অবস্থা মাত্র। সর্বদাই ধ্বনি-তরঙ্গের গতি হচ্ছে, সম্বিতের রূপে বা জগৎ রূপে। যেখানে সম্বিতের সঙ্গে বহির্জগতের কোনও মিলন বা আঘাত হচ্ছে সেই সেই স্থানেই বা অবস্থাতেই আমাদের 'বাহ্যজগৎ ইতি' অনুভব হয় অর্থাৎ বস্তুসৃষ্টি হয়। আঘাতাবস্থার (point of contact) বাইরে জগৎ বলে কিছু নেই; যা আছে তা অব্যক্ত, অনাহত ধ্বনি (unmanifest vibration) ছাড়া অন্য কিছু নয়। একমাত্র আহত ধ্বনিই বিশেষ অবস্থায় রঞ্জনার সৃষ্টি করতে পারে।

ধ্বনি যে মাত্র স্বরবস্তুতেই আছে এমন নয়, সমস্ত বস্তু বা সংঘাতের মধ্যেই আছে—রূপের মধ্যে আছে, গতির মধ্যেও রয়েছে। যে অবস্থায় ধ্বনিপ্রবাহ কোনও নিয়ন্ত্রণের বা পৌনঃপুনিকতার রূপ পায় সেই নিয়ন্ত্রিত বা পৌনঃপুনিক নিবদ্ধ অবস্থা হল ছন্দ; ভরত যে বলেছেন—যেখানে শব্দ সেখানেই ছন্দ তার অর্থ শব্দ প্রত্যক্ষ হতে গেলেই একটি না একটি নিবদ্ধ রূপ পাবেই, সুতরাং ছন্দ এসে পড়ছে। যাবতীয় বস্তুর রূপ ও গতির মধ্যে ধ্বনি রূপান্তরিত হয়ে ব্যক্ত বা অব্যক্ত ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে।

নাদবস্তু বা ধ্বনির মধ্যে বিকাশের, সৃষ্টির বেগ রয়েছে; এই বেগ যখন

বিশিষ্ট ছন্দে বাঁধা পড়ে তখনই আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ছন্দের মধ্যে পৌনঃপুনিকতা আছে বলেই আন্দোলনও পৌনঃপুনিক ধর্ম গ্রস্ত।

আমাদের সম্বিৎ বা চৈতন্যের মধ্যেও ধ্বনিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণভাবে চলেছে। যেখানে যখন সম্বিতের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধন হচ্ছে সেখানে ও তখনই ছন্দ-সৃষ্টি হচ্ছে যাকে বিশেষ অবস্থায় আমরা বুঝতে পারি। প্রতিদিনের অভ্যস্ত আধ্যাত্মিক প্রবাহই আমাদের স্বচ্ছন্দ—যাকে আমরা বুঝতে পারি বিকার দিয়ে বা অভাব দিয়ে। যখন বহিরাগত সংগীতের ধ্বনিগুলি অন্তঃস্থিত ধ্বনিপ্রবাহের সঙ্গে মিলিত হতে থেকে অভিনব সুখকারক আন্দোলনের সৃষ্টি করে তখন আমরা সহৃদয়ই বা কি, সাধারণই বা কি, সকলেই বুঝতে পারি একটা আনন্দময় আন্তরিক পরিবর্তন আমাদের স্বচ্ছন্দতার স্রোতকে অভিভূত করে নিজকে কিছুক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই পরিবর্তন উপভোগ করবার জন্য রসশাস্ত্র বা সংগীতশাস্ত্র পড়বার প্রয়োজন নেই; এ হ'ল শিল্পী পরিবেশিত উৎকৃষ্ট বস্তুর নিজস্ব দ্রব্যগুণ থেকে লব্ধ প্রভাব-বিশেষ।

আমাদের দেহযন্ত্রের প্রান্তবর্তীস্থানে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি রয়েছে যারা বহির্জগতের ধ্বনিপ্রবাহ গ্রাস করতে সর্বদাই ব্যস্ত। সংগীতের অন্তর্গত ব্যাপারগুলি, শব্দ রূপ ও গতিগুলি—বিলক্ষণ ধ্বনিসমূহকে এমন একটি ইন্দ্রিয়ের গ্রহণপথে পৌঁছে দেয় যা আন্তরিক ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র সম্বিতেরই একটি আনন্দরূপ আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

ধ্বনিপ্রবাহের গোড়ার দিকের স্পন্দন ও উল্লসনের রূপই নটরাজের ধ্যানে পর্যবসিত হয়ে আছে। ইনিই পরমেশ্বর শঙ্কর 'নাদতনু'। আবার এদিকে অর্থাৎ বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগতের মিলনমুখে যে প্রীতিদায়ক আন্দোলন হচ্ছে উৎকৃষ্ট সংগীতের মধ্যে যাকে চরমরূপে পাওয়া যায়, যাকে অন্যরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকাদিতেও পাওয়া যায় এবং কদাচিৎ কখনও অকস্মাৎ প্রাকৃতিক শ্রাব্য-দৃশ্যাদির সমাবেশের মধ্যে পাই—এই আনন্দের বা আন্দোলনের

প্রত্যক্ষ রূপকেই নটরাজের লীলারূপ মনে করে রবীন্দ্রনাথ পুরাতন কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট্ নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।..."

উৎকৃষ্ট গীতবাদ্যনৃত্তরূপ ত্রিধারার মধ্যে আহত ধ্বনিগুলির শ্রাব্য ও দৃশ্যরূপ প্রত্যক্ষ করার সময়ে আমরা ক্ষণকালের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে ব্যক্তিগত বন্ধন-সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বরূপ ছন্দের মধ্যে ডুবে যাই। এই অবগাহনের সীমা-পরিসীমা হয় না, এর তুলনা হয় না, এর বর্ণনা অসম্ভব। কেউ বলেন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় কারণ নাদই ব্রহ্ম, কেউ বলেন ভগবানের লীলামৃতেরই আস্বাদ লাভ হয়। কারণ বিশ্বরূপের নিগূঢ় অন্তস্তলেই ত লীলানৃত্ত হচ্ছে। এরপর মন্তব্য অনাবশ্যক, আলোচনা অসম্ভব। সেই প্রাচীন ঋষি যিনি বলে গিয়েছেন হে বিশ্ববাসী, তোমরা আমার কথাটি শোন, তোমরা অমৃতেরই সন্তান, সেই ঋষির কথাই সত্য মনে করে বলতে হয়—আমরা সকলেই অধিকারী, অনধিকারী কেউ নই; কারণ আমরা সকলেই সে অমৃতকে বহন করছি।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৫	সেজরাব	মেজরাব
১১	৭	বাজময়	ধাতুময়
১১	১৭	ঢবুস	ঢবস
১১	১৭	রুঞ্জাল	রুঞ্জা
১১	১৭	মণ্ডি, ডক্কা	মণ্ডিডক্কা
১১	১৮	ডক্কু	ডক্কুলী
১২	৭	ত্রয়োদশ	ত্রয়োদশী
১২	১৪	রজনাকর	রঞ্জনাকর
৩৫	৮	শুষ্কগীতানুগ	শুষ্ক, গীতানুগ
৩৮	২৬	উপস্থাশ্রিত	উপস্থাপিত
৩৯	৩	ভজনী	ভঞ্জনী
৪০	১৭	একটা	এটা
৪২	৯	হলেই	হলেও
৪৪	৮	বতনচেষ্টা	বর্তনচেষ্টা
৪৯	১৩	উল্লাসনধর্ম	উল্লসনধর্ম
৫৭	১৫	একই	এক
৫৮	২৪	পর্যকিকাশায়িত	পর্যঙ্কিকাশায়িত
৬১	১৯	ঘটুক। তার	ঘটুক, তার
৬২	৮	আশোভন	অশোভন
৬৪	৭	পরমেশ্বরের	পরমেশ্বর

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫ বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩ বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ